# স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

**ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার অবদান একটি মাইল ফলক** — পৃঃ ১৭

**স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দলগুলি স্বাধীনতার পর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক** — পৃঃ ১৩

৭৬ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ১২ আগস্ট, ২০২৪।। ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

## ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস স্মরণে

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

**পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা**

৭৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১২ আগস্ট - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com


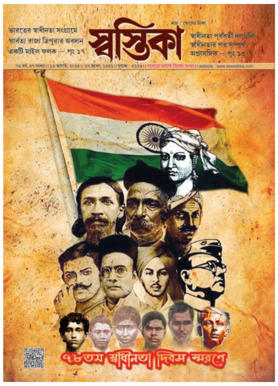



**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

*ফঃ ১*


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ☐ ৫

**অভিষেকের অতিসক্রিয়তা কি মমতা জমানার শেষের ইঙ্গিত? : উড়িসনে রে পায়রা কবি** ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

**হাসিনা-কাণ্ড এ বঙ্গেও হতে পারে দিদি** ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

**পরিচয় প্রকাশে আপত্তি কেন?** ☐ আশিস রাই ☐ ৮

**বাংলাদেশে তথাকথিত ছাত্র-আন্দোলন : মৌলবাদী ও ভারত-বিরোধী বৈদেশিক শক্তি উভয়ই সক্রিয়**

☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

**পশ্চিমবঙ্গে ভারসাম্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে** ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১১

**স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দলগুলি স্বাধীনতার পর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক**

☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১৩

**স্বাধীনতার পর স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের অগ্রগতি**

☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ১৫

**ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার অবদান একটি মাইলফলক** ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৭

**চিকিৎসকরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী** ☐ ডাঃ কনক চৌধুরী ☐ ১৯

**ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদানে মেদিনীপুরের বিপ্লবী ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা**

☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ২৪

**ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিভঙ্গী**

☐ দীপক খাঁ ☐ ৩৫

**বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ**

☐ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

**ফিরে দেখা কলকাতা নরসংহার : ১৯৪৬**

☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৪৬


**নিয়মিত বিভাগ :**


**☐ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ☐ পরম্পরা : ৩১-৩৪ ☐ খেলার জগৎ : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮**

প্রকাশিত হবে ১৯ আগস্ট, ২০২৪

# স্বস্তিকা
## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৯ আগস্ট, ২০২৪

# সামাজিক জীবনে রাখিবন্ধনের গুরুত্ব

রাখির সঙ্গে বন্ধন কথাটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে বোনেরা ভাইয়ের সুস্থ ও দীর্ঘজীবন কামনা করে। রাখিবন্ধন উৎসবের একটি বৃহত্তর তাৎপর্যও বিদ্যমান। ভাইয়ের সার্বিক রক্ষায় বোনেদের প্রার্থনার মতো রাষ্ট্ররক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, মঠ-মন্দির ও দেশের সীমান্ত রক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়ীকরণের বিষয়সমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রাখিবন্ধনের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বিশিষ্ট লেখকরা।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**

**Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প

পনেরো আগস্ট। ভারতবাসীর স্বাধীনতা দিবস। দেশবাসীর আবেগের দিন হইলেও এই বিশেষ দিনটি জাতির নিকট যুগপৎ বিষাদ ও আনন্দ দুই-ই বহন করিয়া আনে। বিষাদ এই জন্য যে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদন করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। আর আনন্দের কারণ হইল, দেশবাসী পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে। স্বাধীনতা উদ্‌যাপনে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বলা হইয়া থাকে, দুইশত বৎসরের পরাধীনতা অর্থাৎ দুইশত বৎসরের বিদেশি শাসন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জাতিকে কী ভীষণ অনৃতভাষণ শোনানো হইয়াছে! আটশত বৎসরের অত্যাচারী পাঠান-মুঘল শাসনামলের কথা একবারও উচ্চারণ করা হয় না। যে পাঠান-মুঘলরা ভারতভূমির শত শত মঠ-মন্দির-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে, হত্যা করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানি করিয়াছে, জাতির জীবনে অন্ধকার যুগের সূচনা করিয়াছে, সেই দুঃখের, সেই বেদনার কালখণ্ডকে একবারও স্মরণ করা হয় না। স্বদেশ, স্বধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য যে বীর যোদ্ধারা মরণপণ লড়াই করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করা হয় না। বিধর্মী আক্রমণকারীদের হাত হইতে সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যে শত শত স্বাভিমানী মাতা-ভগিনী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও স্মরণ করা হয় না। বর্তমান প্রজন্মকে জানানো হয় না যে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ করিবার বিনিময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জানানো হয় না যে, দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে যাঁহারা লড়াই করিয়াছিলেন, যাঁহাদের পরিবারের কেউ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম স্বাধীনতা দিবসেই বিদেশি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন। স্বাধীনতা দিবস যেইরূপ আনন্দ-উৎসবের দিন, সেইরূপ বেদনার স্মৃতিচারণেরও দিন। ভারতসন্তানদের নিকট দেশ শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড নহে, দেশ দেবীমাতৃকা, সাক্ষাৎ জননী। তাই স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প হওয়া উচিত ছিল, দেশমাতৃকার অখণ্ড রূপের পুনঃস্থাপন। সুখের বিষয়, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ১৪ আগস্ট 'অখণ্ড ভারত দিবস' রূপে পালিত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ ১৯৪৭ সালের পর হইতেই এই দিনটিতে ভারতমাতার পূজা করিয়া অখণ্ড ভারতে সংকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা দিবসে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, বীরগতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিতর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই হিসাব করিবারও দিন যে, দেশের অগ্রগতি কতটুকু ঘটিল, দেশে স্ব-তন্ত্র কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হইল। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর যাঁহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এই বিষয়ে কোনোপ্রকার আন্তরিক সদিচ্ছা দেখাইতে পারেন নাই। স্বাধীনতা দিবসে তাঁহারা নিজেদের অথবা দলের গুণকীর্তনেই ব্যস্ত থাকিতেন। ক্ষমতা ভোগে তাঁহারা এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, দেশের অগ্রগতি অথবা জাতিগঠনের ন্যায় মহান কার্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অথবা বিষয়টি তাহাদের মন ও মস্তিষ্কে স্থানই পায় নাই। তাহারই ফলশ্রুতিতে বহু বৎসর যাবৎ দেশবাসী উন্নয়নের এবং স্বাভিমানী জীবনের স্বাদ পায় নাই। বিশ্বের দরবারে তখন ভারতের দীন-হীন অবস্থা। কারণে-অকারণে শত্রু দেশগুলির চোখরাঙানি সহ্য করিতে হইত। ভারতবাসীর সৌভাগ্য, ভারতমাতার সুসন্তানদের হস্তে বর্তমানে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হইয়াছে। তাহার ফলেই দেশ ক্রমশ পূর্ব গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই স্বাধীনতার বহু বৎসর পর দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হইবার কারণেই বর্তমান প্রজন্ম স্বাভিমানী হইয়া উঠিতেছে। বিদেশি বিচারব্যবস্থা বর্জন করিয়া ভারতীয় ফৌজদারি আইনব্যবস্থা— ন্যায় সংহিতা প্রণয়ন হইয়াছে। জাতির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটে বহুবিধ প্রকল্প রূপায়িত হইতেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র স্বয়ম্ভর হইয়াছে। ইহা সবকিছুই স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ। এতৎ সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মকে দেশবিভাগের করুণ কাহিনি স্মরণ করাইতেই হইবে। স্বাধীনতা দিবসে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ইত্যাদির সহিত দেশবাসীকে সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে অখণ্ড ভারত পুনঃস্থাপনের। ইজরায়েলের নিকট হইতে শিক্ষা লইতে হইবে, আগামী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইবে অখণ্ড ভারতবর্ষে। ইহা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরিয়া করিতে হইলেও করিতে হইবে। পনেরো আগস্টে ইহাই সংকল্প হউক ভারতবাসীর।

## সুভাষিতম্

**সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।**
**সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।। (ঋগ্বেদ- ৮। ৪৯। ৪)**

আমাদের উদ্দেশ্য এক হোক, আমাদের ভাবনা এক হোক, আমাদের মন এক হোক। যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কিছুই একভাবে রয়েছে।

## অভিষেকের অতিসক্রিয়তা কি মমতা জমানার শেষের ইঙ্গিত?

# উড়িসনে রে পায়রা কবি

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

অনেকে দাবি করছেন রাজ্যে অভিষেক জমানা শুরু হয়েছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তরুণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন, 'উড়িসনে রে পায়রা কবি/খোপের ভিতর থাক ঢাকা/তোর বকবকানি ফোঁস ফোঁসানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা/বের করলি গ্রন্থ এক/নগদমূল্য এক টাকা'। সপ্তদশ সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির হার ২৬ শতাংশ। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে দু'জনেই খন্দে পড়ে। ডায়মণ্ডহারবারের মানুষ তাঁকে সর্বোচ্চ ভোটে জিতিয়েছেন। জড়বুদ্ধিও জানে তা কিসের জয়। তৃণমূল পেশাদার পারিবারিক দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়ার মতো সব অধিবেশনে থাকেন। তাই অন্য সাংসদরা রবার স্ট্যাম্প। তেরো বছরে তৃণমূলের কোনো সাংসদ চমৎকার কিছু বলেননি। মহুয়া মৈত্র নতুন কিছু বলতে গিয়ে দেশবিরোধী কাজ করেছেন। ভোটে জিতে সে ময়লা ধোয়া যাবে না। মহুয়ার দুঃসাহস আর কেউ দেখাবে না।

রাজা আসে রাজা যায়। সংসদে এটাই তৃণমূলের উপস্থিতি। অভিষেকবাবুর অনায়াস জয় কেঁদে বলছে সত্য তব ভাণ্ডারে বিবিধ রতন। ভাবতে লজ্জা লাগে এটা পশ্চিমবঙ্গ। সংসদে অভিষেকের সক্রিয়তায় অনেকে স্তম্ভিত। তাহলে অভিষেক কী তৃণমূলের দখল নিচ্ছে নাকি গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায় নিজেকে সক্রিয় রাজনীতিতে আরও বেশি করে নিয়োগ করছে? অভিষেক দাবি করেছেন তিন মাসের ভিতর দল আর প্রশাসনের খোলনলচে পালটে দেবেন অথচ তিনি মমতা প্রশাসনের কেউ নন। হতেই পারে মমতার নির্দেশে তাঁর প্রিয় 'বাবু' (অভিষেক) এই দাবি করেছেন। দলের বৃদ্ধ গোষ্ঠীর কাছে নিজের গুরুত্ব আর নির্ভরযোগ্যতা তুলে ধরতে চাইছেন। মন্ত্রী অখিল গিরির বিদায় হয়েছে। আর এই দিয়েই অভিষেক জমানা শুরু। জনৈক মহিলা ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে ক্ষমতার অভব্য প্রয়োগ করতে গিয়ে গিরি ভুলে গিয়েছিলেন মমতা প্রশাসনে রাজীব কুমার আর আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়রা সজীব থাকেন। পরজীবী নেতারা নয়।

অভিষেকের দাপট যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার বড়ো প্রমাণ অভিষেক বিরোধী বলে পরিচিত সুব্রত বক্সীর আচমকা পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বাসনা।

পঞ্চায়েত ভোটের আগেও বক্সি এই অনুরোধ করেছিলেন। একই সঙ্গে অপর এক অভিষেক বিরোধী মন্ত্রী ফিরহাদ তার উগ্র মুসলমানিপনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মুসলমান দরদের কথা তাঁকে গিলতে হয়েছে। শুনেছি ফিরহাদের পালটা আরেকটি সমান্তরাল মুসলমান গোষ্ঠী অভিষেক তৈরি করে ফেলেছেন। তারাই তৃণমূলের ভোট করবে। তৃণমূল এখন পেশাদারি ব্যবসায়িক সংস্থা যা চালায় আইপ্যাক। মমতা আর অভিষেক তার সর্বক্ষণের কর্মী আর প্রচারক। বাকিরা যন্ত্র। আগামী ভোটে এই পেশাদারিত্বকে টক্কর দিতে রাজ্য বিজেপির পেশাদারী সাহায্য নেওয়া উচিত। শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধের মতোই তৃণমূল রাজত্বকে ভাঙতে 'এক ধাক্কা ঔর দো' দিতে হবে। মমতা বিরোধী বাকি দল 'ক্যানসার আক্রান্ত'। কোনো পেশাদারিত্ব আগামী দিনে তাদের বাঁচাতে অক্ষম। তাদের যৌথ (কং-সিপিএম) ১১ শতাংশ ভোট আগামীতে কোন বাক্সে যাবে সেটাই দেখার।

এবারের নির্বাচনে বিরোধী ভোট কেটে সিপিএম মমতাকে ১৪ আসন উপহার দিয়েছে। তুলনায় অনেক বড়ো শক্তি বিজেপির কাছে নিঃশেষিত না হয়ে তারা এবার তৃণমূল ডোবায় ডুবেছেন। ফেল করা ছাত্র পাশ করলে যা হয় অভিষেককে নিয়ে তৃণমূল সে ঢাক পিটছে। বিজেপি একটু দমে যাওয়ায় বেড়ালরা সব বাঘ হতে চাইছে। একচ্ছত্র বিজেপি জমানাতে অভিষেক দশ বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। একবার জেগে উঠে অর্থ চাইতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার হন। এখন সক্রিয় হয়ে মমতার সঙ্গে রাহুল গান্ধীর কথা বলাচ্ছেন। মমতার নীতি আয়োগ নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। ইডি আর সিবিআই নিয়ে অভিষেক আর রাহুল একমত। ফাঁকে পড়ে দমবন্ধ পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরীর। রাজ্যে কংগ্রেসের হাতে এখন আট শতাংশ ভোট। তাই কানু বিনা গীত নাই। অধীর মমতা বিরোধী, বিজেপি বিরোধী কিনা স্পষ্ট নয়। কংগ্রেস বিজেপি বিরোধী, মমতা বিরোধী কিনা তা অস্পষ্ট। এই জটিলতায় ঢুকেছে নতুন তিরিশোর্ধ্ব পায়রা কবি। আবার পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। অভিষেক কোনটা সেটাই দেখার। এটাই অন্ধ তৃণমূলের খন্দ গল্প। □

# হাসিনা-কাণ্ড এ বঙ্গেও হতে পারে দিদি

নির্বাচনজয়ীষু দিদি,

বাংলাদেশের দিকে দিদি আপনার নজর নিশ্চয়ই রয়েছে। আমিও দেখছি। দিদি, আগস্টের ৫ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। আর মাত্রই ছ' মাস আগে গত ৭ জানুয়ারি 'অবাক' জয় পেয়েছিলেন হাসিনা। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৪টিতে জয় পেয়েছিলেন হাসিনা। তবে সবচেয়ে বড়ো চমক ছিল স্বয়ং হাসিনার জয়ে। ঠিক আপনার মতোই। পঞ্চায়েত বা পুরসভার নির্বাচনে আপনি ঠিক যেমনটা করেন তেমনই করতেন হাসিনা আপা। সেই তথ্য আপনার জানা, তবু আর একবার জানাচ্ছি। কারণ, দিদি আপনিও হাসিনার মতো খালি জিততে ভালোবাসেন।

ঢাকা প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী হিসেবে হাসিনা নির্বাচনে লড়েছিলেন। এই গোপালগঞ্জেই হাসিনার জন্ম। সেই আসনে এবারের ভোটের ফল ছিল অবাক করা। গোপালগঞ্জ-৩ আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা দু'লক্ষ ৯০ হাজার ৩০০। এর মধ্যে হাসিনা পান দু'লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনপিসি-র শেখ আবুল কালাম পান ৪৬০টি ভোট। আর ৪২৫টি ভোট পেয়ে ওই কেন্দ্রে তৃতীয় হন জাকের পার্টির প্রার্থী মাহাবুর মোল্লা। হাসিনা জিতেছিলেন দু'লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০২ ভোটের ব্যবধানে। বুঝতে পারছেন দিদি! একবার মিলিয়ে নিতে পারেন গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার আসনের ভোটের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বকালীন রেকর্ড ব্যবধানে সাত লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন অভিষেক দাদা। ভাবুন তো রাজ্যের একমাত্র একটা কেন্দ্রে এমন জয় সম্ভব ছিল! আমি কখনও-ই চাই না হাসিনার দশা অভিষেক দাদার হোক, কিন্তু আপনার দলের জয়ের সঙ্গে আওয়ামি লিগের মিল রয়েছে।

১৯৯১ সাল থেকেই টানা গোপালগঞ্জ-৩ কেন্দ্রে ভোটে লড়ছেন হাসিনা। প্রতিবারই জয়ী হয়েছেন। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওই কেন্দ্রে ৯৯.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিলেন। বিরোধীদের মোট ভোট ছিল ১৯৪টি। তার আগের বারে ২০১৪ সালের নির্বাচনে হাসিনা ভোট পেয়েছিলেন ৯৮.৭ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পান ১.৩ শতাংশ। তবে ১৯৯১ সালে প্রথমবার গোপালগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী হয়ে হাসিনা পেয়েছিলেন ৭২.২ শতাংশ ভোট। ১৯৯৬ সালে সেটা বেড়ে হয়ে যায় ৯২.২ শতাংশ। ২০০১ এবং ২০০৮ সালে হাসিনার প্রাপ্ত ভোট আরও বেড়ে হয় যথাক্রমে ৯৪.৭ ও ৯৭.১ শতাংশ। বাড়তে বাড়তে ২০২৪ সালে ওই আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের ৯৯.৬৫ শতাংশই পান হাসিনা। যে ভাবে প্রতিবার আপনার দলের প্রার্থী অভিষেক দাদা ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছেন।

২০১১ সালে বাঙ্গলায় ভোটের বাক্সে যা হয়েছিল সেটাই বাংলাদেশে ২০২৪ সালে রাস্তায় নেমে হয়েছে। আপনার অনুগত ভাই হিসেবে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম দিদি। রাষ্ট্র আর রাজ্যের ফারাক আমি বুঝি। সঙ্গে এটাও বুঝি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলে জনতা ক্ষমা করে না।

অতীতেও হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময়ে ভোট নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়। হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৪ সালের নির্বাচনী বিএনপি বয়কট করে। ২০১৮ সালের নির্বাচন বাংলাদেশে 'রাতের ভোট' নামে পরিচিত। কারণ, সে বার অভিযোগ উঠেছিল, অসংখ্য বুথে নির্বাচনের আগের রাতেই ভোটবাক্স ভরে গিয়েছিল অবৈধ ব্যালটে। সেবার ২৫৭ আসনে জিতেছিল হাসিনার দল। এবার আসন কমলেও অন্য অভিযোগ ছিল। এবার ২২৪ আসনে আওয়ামি লিগ জিতলেও বিরোধী পক্ষ বলতে ছিল একগুচ্ছ নির্দল সাংসদ। মোট ৬৩ জন নির্দল প্রার্থী জেতেন। অভিযোগ ওঠে, জয়ীরা অধিকাংশই আওয়ামি লিগের টিকিট না পেয়ে ভোটে দাঁড়ান। কেউ কেউ আবার লিগের হুকুমেই দলবিহীন ডামি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়েন। মোদ্দা কথা, যেন -তেন-প্রকারেণ দলের আসন বাড়ানোতে আপনার দলের সঙ্গে বড়োই মিল ছিল হাসিনার।

এ রাজ্যে অতীতে এমন হয়নি তা নয়। বুদ্ধবাবুরা পঞ্চায়েত দখলে রাখতে এটাই করতেন। রেকর্ড ভোটে জয় পেয়ে নজির গড়েছিলেন কেশপুরের নন্দরানি ডল। আরামবাগে সিপিএমের অনিল বসু। কিন্তু একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বামেদের দাপট। আপনিও কিন্তু সেই পথেরই যাত্রী। ২০১১ সালে বাঙ্গলায় ভোটের বাক্সে যা হয়েছিল সেটাই বাংলাদেশে ২০২৪ সালে রাস্তায় নেমে হয়েছে। আপনার অনুগত ভাই হিসেবে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম দিদি। রাষ্ট্র আর রাজ্যের ফারাক আমি বুঝি। সঙ্গে এটাও বুঝি, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলে জনতা ক্ষমা করে না। □

অতিথি কলম

আশিস রাই

# পরিচয় প্রকাশে আপত্তি কেন?

**বিএনএস আইনের ৩১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সেজে নকল নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে বা জেনে বুঝে কোনো একজনকে অন্য আরেক জন বলে দেখানোর চেষ্টা করে বা নিজে ও অন্য কাউকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচয় দেয় (বাস্তবে যা তারা নয়), তবে এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজের জন্য তার বা তাদের ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে।**

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'আইন-শৃঙ্খলা' হলো রাজ্যের অধীনস্থ বিষয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নানা সময় বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের তরফে নির্দেশাবলী জারি করা হয়ে থাকে। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগর জেলার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের তরফে জারি করা এমনই একটি নির্দেশিকাকে ঘিরে হঠাৎ করেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্দেশিকাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক দেশ জুড়ে সম্প্রতি একটি প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নটি হলো— নিজস্ব পরিচয় গোপন রেখে এই দেশে কি কোনো ব্যবসা করা যায় বা করা উচিত? পরিচয় গোপন রেখে ব্যবসা কি কোনো নৈতিকতার পরিচয়?

যে কোনো সরকারি প্রকল্পের সুযোগসুবিধা লাভের জন্য পরিচয়পত্র-সহ আবেদন যেখানে জরুরি, সেখানে কোনো ব্যবসায়ীর তরফে তার ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচয় গোপন রাখা কার্যত অর্থহীন ও অনৈতিক। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পরিচয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুজফ্ফরনগর জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকা জারি করে। যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। ব্যবসায়িক পরিচয় প্রকাশকে এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ মাস এলে হরিদ্বারে গঙ্গাজল সংগ্রহের জন্য শিবভক্তদের ঢল নামে। দেশের নানা প্রান্তে শিবভক্তরা নদী থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করে শিবলিঙ্গের জলাভিষেক করে থাকেন। উত্তর ভারতেও এই প্রাচীন পরম্পরা বিদ্যমান। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে হরিদ্বার পৌঁছে শিবভক্তরা গঙ্গাজল সংগ্রহ করে থাকেন। ভগবান শিবের জলাভিষেকের জন্য গঙ্গাজল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নির্গত এই যাত্রা— 'কাঁওড় যাত্রা' নামে পরিচিত। কাঁওর যাত্রা চলাকালীন জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মুজফ্ফরনগর জেলার পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। এই নোটিশে কাঁওড় যাত্রার রাস্তাগুলিতে ব্যবসারত দোকানদারদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। দোকানদারদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বলেও এই নোটিশে জানানো হয়।

এরপর মুজফ্ফরনগর জেলা পুলিশের তরফে জারি করা নোটিশের অনুরূপ নির্দেশিকা সমগ্র উত্তরপ্রদেশ জুড়ে জারি করার দাবি ওঠে। মুজফ্ফরনগর জেলা পুলিশ তাদের তৈরি নির্দেশাবলীতে উল্লেখ করে যে কাঁওড় যাত্রীরা শ্রাবণ মাসে কাঁওড়যাত্রা চলাকালীন পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রচুর সংখ্যক কাঁওড়যাত্রী হরিদ্বার পৌঁছে জল সংগ্রহ করে মুজফ্ফরনগর জেলার ওপর দিয়ে ফিরতে থাকেন। পবিত্র শ্রাবণ মাসে বহু ব্যক্তি, বিশেষত কাঁওড় যাত্রীরা খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ও সংযম পালন করে থাকেন। এই সময় কিছু খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ থেকে তাঁরা বিরত থাকেন। কাঁওড় যাত্রীদের যাত্রাপথে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পসরা সাজিয়ে বসা কিছু দোকানদার নিজেদের দোকানের এমন নামকরণ করে, যার ফলে কাঁওড় যাত্রীরা নানাভাবে বিভ্রান্ত হন। এর আগে মুজফ্ফরনগর জেলা জুড়ে এরকম একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। নিয়ম,ব্রত পালনকারী কাঁওড়যাত্রীরা বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার দরুন বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও ঘটে।

সবরকম অনভিপ্রেত ঘটনা রুখতে, পুণ্যার্থী কাঁওড়যাত্রীদের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জেলা পুলিশের তরফে কাঁওড় যাত্রার অন্তর্গত রাস্তাগুলির ওপরে থাকা হোটেল, ধাবা মালিক ও নানা খাদ্য-পানীয় বিক্রেতাদের একটি অনুরোধ জানানো হয়। হোটেল মালিক ও দোকানদারদের তাদের নিজেদের এবং তাদের দোকানের/হোটেলের কর্মচারীদের নাম লিখতে বলা হয়। সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি করা এই প্রশাসনিক নির্দেশের লক্ষ্য ছিল না। মুজফ্ফরনগর জেলার ওপর দিয়ে চলাচলরত পুণ্যার্থী কাঁওড় যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জারি

হয় এই নির্দেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে কাঁওড় যাত্রা চলাকালীন এইরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত এর আগেও রয়েছে।

**এই নিয়ম নতুন নয় :** কাঁওড় যাত্রীদের অগ্রহণীয় খাদ্য বিক্রি ও পরিবেশনগত বিপত্তি এড়াতে, পুণ্যার্থীদের জন্য নিরাপদ খাদ্যের জোগানের বিষয়টি মাথায় রেখে দোকানদারদের নাম ও পরিচয় প্রকাশের এই নিয়ম কিন্তু নতুন নয়। এই সংক্রান্ত আইন থাকলেও তার প্রয়োগ এতদিন হয়নি। ২০০৬ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকার নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং খাদ্যের গুণমান রক্ষায় একটি আইন তৈরি করে। সেই আইনটি হলো— 'দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যাক্ট, ২০০৬' বা খাদ্য সুরক্ষা ও মানক অধিনিয়ম। ২০০৬ সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপতি এই আইনটিতে অনুমোদন দেন। ২০১১ সালের ৫ আগস্ট এই আইনের বিভিন্ন ধারাগুলি দেশ জুড়ে বলবৎ হয়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের আমলে এই আইন পাশ ও তার প্রয়োগ শুরু হয়। এই আইনটি হলো খাদ্যসংক্রান্ত বিধিসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন। খাদ্য তৈরির নানা সামগ্রীর বিজ্ঞানভিত্তিক গুণমান নির্ধারণ থেকে শুরু করে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য বণ্টন, বিক্রয় ও আমদানিকে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত করতে, খাদ্যসামগ্রীসমূহকে মানুষের আহারের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ, উপযোগী করে তুলতে, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং এই সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় দেখভালের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে এই আইনের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়— 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস্ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' বা ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও মানক প্রাধিকরণ।

খাদ্য সুরক্ষা ও মানক অধিনিয়ম, ২০০৬-এর ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিনা লাইসেন্সে কোনো দোকান চলতে পারে না। খাবার বিক্রেতারা যদি প্রয়োজনীয় 'ফুড লাইসেন্স' ছাড়া ব্যবসারত খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করে, তবে এই আইনের ৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেই বিক্রয়কারীর ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

দোকান বা ব্যবসার রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই খাদ্য ও পানীয় বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে দু'লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য হতে পারে। এই আইনে 'ফুড লাইসেন্স'-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী দোকানের মধ্যে স্পষ্টভাবে 'রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট' প্রদর্শন বাধ্যতামূলক।

ব্যবসার স্থানে বা দোকানে ব্যবসার পরিচয়বাহী ফলক বা সাইনবোর্ড প্রদর্শিত না হলে দু'বার সেই ব্যবসায়ীকে নোটিশ দেওয়া হবে। দু'বার সেই নোটিশ অগ্রাহ্য করলে বা সেই নির্দেশ পালন না করলে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক (ফুড সেফটি অফিসার) জরিমানা করতে পারেন। ফুড সেফটি আইনের ৫৩ নম্বর ধারা অনুসারে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দশলক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার আইনি বিধান রয়েছে। 'উত্তরপ্রদেশ দোকান ও বাণিজ্য অধিষ্ঠান অধিনিয়ম, ১৯৬২' আইন অনুযায়ী ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী বা দোকানদারদের রেজিস্ট্রেশন থাকা বাধ্যতামূলক।

**পরিচয় গোপন রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ :** ভারতীয় আইনের প্রয়োগের লক্ষ্যে মুজফ্ফরনগর পুলিশ নোটিশ জারি করলে দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা দোকানের ওপর তাদের নাম লিখতে শুরু করে। তারা তাদের ব্যবসায়িক পরিচয় সামনে আনলে দোকানগুলির নামধাম পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। দোকানগুলির ওপরে থাকা সাইনবোর্ডগুলির পরিবর্তন স্থানীয় লোকজনের নজরে এলে এতদিন যে বেআইনি কাজ চলছিল সেটা তারা বুঝতে পারেন। হিন্দু নাম নিয়ে মুসলমান দোকানিরা সেখানে দোকান খুলেছিল। এমনকী হিন্দু দেব-দেবীদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে সেখানে তাদের বহু দোকান চলছিল। ২০২৩ সালে প্রণীত 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (বিএনএস) আইন অনুযায়ী এটি একটি অবৈধ কাজ। বিএনএস আইনের ৩১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সেজে নকল নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে বা জেনে বুঝে কোনো একজনকে অন্য আরেক জন বলে দেখানোর চেষ্টা করে বা নিজে ও অন্য কাউকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচয় দেয় (বাস্তবে যা তারা নয়), তবে এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজের জন্য তার বা তাদের ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে।

দোকানগুলিতে এতদিন ধরে চলে আসা বেআইনি সাইনবোর্ড ও সেই বোর্ডে ব্যবসায়ীর নকল নাম ও পরিচয়ের এই নিদর্শন মেলায় গোটা দেশে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রবল বিতর্ক। মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে, মুসলমানদের তরফে হিন্দু নাম ও পরিচয় ব্যবহারের কারণ কী? নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার ক্ষেত্রে তাদের আসল উদ্দেশ্য কী? ভারতীয় ফৌজদারি আইনে 'অপরাধমূলক অভিপ্রায়'-এর (mens rea) উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হলো জেনে-বুঝে কারুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল মানসিকতা বা যে চিন্তাভাবনা অপরাধমূলক পরিকল্পনা-প্রসূত। নিজেদের দোকানের সাইনবোর্ডে মিথ্যা নাম-পরিচয় লিখে রেখে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতারণা, তাদের অনুভূতিতে আঘাত করার এই কার্যকলাপ একটি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ মানসিকতাকেই বেআব্রু করে।

কর্ণাটকের হিজাব ইস্যুতে ইসলামপন্থীরা ও আসাদুদ্দিন ওয়েসি সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারের দোহাই পেড়ে শিক্ষাঙ্গনে হিজাব সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাকে তাদের পরিচয়ের ওপর আক্রমণ বলে তোপ দেগেছিলেন। কিন্তু পরিচয় লুকিয়ে অবৈধ উপায়ে ব্যবসা চালানোর পর সেই ঘটনা সামনে এলে সচতুর কৌশলে পুলিশি নোটিশকেই 'সাম্প্রদায়িক' বলে দাগিয়ে দিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটানো হলো। কাঁওড় যাত্রীদের যাত্রাপথে থাকা দোকানগুলির মালিকদের নাম লিখে তাদের পরিচয় জানানোর জন্য মুজফ্ফরনগর জেলা পুলিশের তরফে জারি এই নির্দেশকে অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি তীব্রভাবে আক্রমণ করে জানিয়েছে যে এই নির্দেশ ভারতে থাকা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার পরিচয়বাহী। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার এবং বিরোধী ইন্ডিজোটকে সমালোচনায় বিদ্ধ করে ওয়েসির বক্তব্য হলো যে এই 'ঘৃণা' রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের হিন্দু নেতৃত্বের কারণে ছড়াচ্ছে যারা নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ওয়েসির এই সাম্প্রদায়িক বিবৃতির পরেই ভোটব্যাংক বাঁচাতে আসরে নামে ইন্ডিজোট। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি-সহ ইন্ডিজোটের প্রায় সব ক'টি দল মিলে মুজফ্ফরনগর জেলা পুলিশের জারি করা এই নির্দেশিকাকে তুমুল আক্রমণ শুরু করে। এই নির্দেশিকার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তোষণের রাজনীতি করে, নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ভিত্তিহীন বিতর্ক সৃষ্টি করে ভোট ময়দানে প্রাসঙ্গিক থাকাই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

*(লেখক সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী)*

# বাংলাদেশে তথাকথিত ছাত্র-আন্দোলন

## মৌলবাদী ও ভারত-বিরোধী বৈদেশিক শক্তি উভয়ই সক্রিয়

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশ। সেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের পতন ও সেনার ক্ষমতা দখল। একটা ইসলামি দেশের চরিত্র যেমনটা হওয়া উচিত, ঠিক তেমনটাই হয়েছে বাংলাদেশের ভবিতব্য। এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু অবোধের গোবধে আনন্দের মতো এপারের কিছু বাংলাদেশ-প্রেমী নেটিজেনদের সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাসের বহর দেখে কে বলবে এই ঘটনা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রীলংকা, ভুটান, নেপালের মতো ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বিগত এক দশকে কব্জা করেছে চীন। তাদের একটাই লক্ষ্য যেন-তেন- প্রকারেন ভারতকে বেকায়দায় ফেলা। মোদী সরকারের সফল কূটনীতির দৌলতে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেই ভারতের সুসম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল। শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই বেশ ভালো। তিনি ভারতবন্ধু হিসেবেই পরিচিত। অন্যদিকে বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া যে চীন-পাকিস্তানের মন জুগিয়ে চলেন এবং প্রকাশ্যেই ভারত-বিরোধী, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একইসঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে, এই দুই আমলেই কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে হিন্দুরা নিরাপদ নন। তাঁদের জীবনহানি ও সম্মানহানি এই দুই আমলেই হয়েছে। তবুও কূটনৈতিক দিক দিয়ে শেখ হাসিনাই ভারতের জন্য সুবিধাজনক।

বাংলাদেশের এই ছাত্র-আন্দোলনের মূল কারণ, সেদেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য কিছু সংরক্ষণ ছিল। ছাত্র আন্দোলনের মূল দাবি ছিল এই সংরক্ষণ বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যাপার আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই এই আন্দোলনকে ভারত-বিরোধী রূপ দেওয়ার একটা মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। ভারত এই আন্দোলনের সাতে-পাঁচে নেই, অথচ বিক্ষোভকারীরা স্লোগান তুলেছিল 'ভারত যাদের মামারবাড়ি, বাঙ্গলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি।' সুতরাং একে স্রেফ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ছাত্র-আন্দোলন বলে লাভ নেই। জুলাই মাসের গোড়ায় শুরু হওয়া এই ছাত্র-বিক্ষোভ অচিরেই ভারত-বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। যার চরম পরিণতি ঘটলো গত ৫ আগস্ট, শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও সেনার ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। লক্ষ্যণীয়, হাসিনা দেশ ছাড়তেই সেনা বাংলাদেশের কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য যে সর্বদল বৈঠক করে তাতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামি লিগই ব্রাত্য। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের দিকে দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মূর্তি ভাঙা, মূর্তিতে জুতোর মালা পরানোর যে হিড়িক শুরু হয়েছে, তা স্পষ্ট বলে দেয় এটা কোনো ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, সেদেশের সর্বোচ্চ আদালত সরকারি চাকরিতে এই সংরক্ষণ নগণ্য করার নির্দেশ দেওয়ার পরও কৃত্রিম উপায়ে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভের নেপথ্যে ভারত-বিরোধী মৌলবাদী শক্তি, বৈদেশিক (পড়ুন চীন-পাকিস্তান) শক্তির হাত যে অবশ্যই আছে, তা পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, সেদেশের বহু জায়গা থেকে হিন্দুদের ওপর নারকীয় তাণ্ডবের খবর আসতে শুরু করেছে। একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে নোয়াখালিতে এক হিন্দু রমণীর আর্তনাদ শোনা গিয়েছে।

> **যে মৌলবাদী ও বৈদেশিক শক্তির মদতে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন যেমন জরুরি, তেমনি এপারে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী যে বিপ্লবীরা ঘরে বসে এক মহান ছাত্র আন্দোলনের গল্প শোনাচ্ছে, তাদের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।**

এই অবস্থায় হাত গুটিয়ে থাকা ভারতের পক্ষে শোভা পায় না। একে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভাবলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাই ক্ষুণ্ণ হবে। যে মৌলবাদী ও বৈদেশিক শক্তির মদতে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন যেমন জরুরি, তেমনি এপারে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী যে বিপ্লবীরা ঘরে বসে এক মহান ছাত্র আন্দোলনের গল্প শোনাচ্ছে, তাদের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

# পশ্চিমবঙ্গে ভারসাম্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে

**আনন্দ মোহন দাস**

সম্প্রতি হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার ফলে আগামীদিনে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। কেউ সমর্থন করছেন, কেউ বিরোধিতা করে চলেছেন। হিমন্ত বিশ্বশর্মা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে মুসলমান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানকার জন্যবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তার ফলে আগামীদিনে এই রাজ্যগুলিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

অপ্রিয় হলেও অসমের মুখ্যমন্ত্রী সহজ সত্যটা সকলের সামনে তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করেছেন। কারণ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন তাঁর রাজ্যে স্বাধীনতার সময় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৭/৮ শতাংশ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যা কমছে এবং মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তারাই নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং আগামী প্রজন্ম নিশ্চিত বেকায়দায় পড়বে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে ১৯৫১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৫ শতাংশ। কিন্তু আজ তা হ্রাস পেয়ে ৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা ৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৮ শতাংশ হয়েছে এবং অন্যান্যরা ২ শতাংশ রয়েছে। ২০২১-এ জনগণনা হলে সংখ্যাটি নিশ্চিত আরও বৃদ্ধি পেত তাতে কোনো দ্বিমত নেই। সম্প্রতি সংসদে লোকসভা সদস্য নিশিকান্ত দুবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের কিষাণগঞ্জ, কাটিহারের জনবিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তনে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই অঞ্চলগুলি নিয়ে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গড়ে তোলার দাবি তুলেছেন। কারণ আগামীদিনে এই অঞ্চলগুলিতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে।

বর্তমানে সারা দেশে ৮৬টি লোকসভা আসনে মুসলমানরা স্থির করে কারা জয়লাভ করবে। পশ্চিমবঙ্গে এরকম ২২টি লোকসভা আসনে মুসলমানরা নির্ণায়ক ভূমিকায় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলমানরাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে শেষ কথা। অর্থাৎ মুসলমানদের সিদ্ধান্ত যে কোনো দিকে মোড় নিতে পারে। আগামীদিনে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর দাবি উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এখানে মুসলমান জনসংখ্যা এবং এমএলএ সংখ্যাধিক্য হবে। পশ্চিমবঙ্গে জনবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যা আগামীদিনে আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করবে।

**বাংলাদেশে স্লোগান উঠেছে ‘ভারত যাদের মামার বাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।’ তবুও বামপন্থীরা তাদের আন্দোলন সমর্থন করছে। এটি কী ধরনের দ্বিচারিতা? প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট ও মুসলমানদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে তা হলো উভয়েই ভোগবাদী।**

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা নীচের Institute of World Demographic Research-এর পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হবে। এটি ধর্মভিত্তিক জনগণনার তথ্য।

| বছর | হিন্দু (%) | মুসলমান (%) |
|---|---|---|
| ১৯৪৮ | ৮৮.২ | ৬ |
| ১৯৫১ | ৮৪.১ | ৯.৮ |
| ২০১১ | ৭৩.২ | ২২.৬ |
| ২০১৭ | ৬৮.৬ | ২৭.২ |
| ২০২১ | ৬৫.৭ | ৩২.৮ |

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় হিন্দু জনসংখ্যা কী হারে হ্রাস পেয়েছে এবং মুসলমান জনসংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী ২০৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হবে। এই ধরনের জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটলে ভবিষ্যতের চিত্রটি কীরকম হতে পারে তা দেখা যাক :

২০৩১ হিন্দু ৬০.৪ শতাংশ, মুসলমান ৩৮.১ শতাংশ

২০৩৭ হিন্দু ৫৫ শতাংশ, মুসলমান ৪৩.৬ শতাংশ

২০৪০ হিন্দু ৩০.৫ শতাংশ, মুসলমান ৬৬.৯ শতাংশ

২০৪১ হিন্দু ১১.২ শতাংশ, মুসলমান ৮৪.৫ শতাংশ

সুতরাং, হিমন্ত বিশ্বশর্মা ভুল কিছু বলেননি। রাজনীতির বেড়াজালে ভোটের চাহিদায় নীরবে জনবিন্যাস পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই অন্ধকারময় দিকটির কথা না ভাবলে পশ্চিমবঙ্গ আগামীদিনে ভারত থেকে

ফ ঃ ২

বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে এক মুসলমান মৌলবির ঘোষণা যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তারা নাকি এগিয়ে চলেছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে বিনা যুদ্ধে একটি দেশকে গ্রাস করার চক্রান্ত চলেছে। এ বিষয়ে এরা মূলত তিনটি কৌশল নিয়ে চলেছে।

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা। ২. বলপূর্বক ধর্মান্তরণ। ৩. অনুপ্রবেশ করা।

সেজন্য ধর্মান্তরণের বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন, এই ভাবে ধর্মান্তরণ চললে মেজরিটি অচিরে মাইনরিটিতে পরিণত হবে। সেজন্য এই বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে অবিলম্বে সরকারের কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১. একদেশ এক আইন। ২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন। ৩. ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন। ৪. অনুপ্রবেশ রুখতে এনআরসি চালু করা।

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, তিনি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' স্লোগানে আস্থা হারিয়ে, 'যো হামারে সাথ, হাম উসকা সাথ হ্যায়' স্লোগান দিতে বলেছেন। কারণ মুসলমানরা (রাষ্ট্রবাদী মুসলমান বাদে) উন্নয়ের স্লোগান বিশ্বাস করে না। তারা বিজেপিকে ভোট না দিয়ে অন্য দলকে ভোট দেয়। সেজন্যই শুভেন্দুবাবু স্লোগানটি পরিবর্তন করার কথা বলেছেন। তিনি হিন্দুত্বের পথে চলার কথা বলেছেন। অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা বলে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা ভারতে ৮৬টি আসন রয়েছে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রতিনিধি নির্বাচনে শেষ কথা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে ২২টি আসনে তারাই ঠিক করে দেয় কোন দল জিতবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠন মজবুত করে হিন্দু ভোট বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। কারণ বিজেপি কোনোকালেই মুসলমান ভোট খুব একটা পায় না। কারণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা তাদের মৌলবি মোল্লাদের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেয়। এমনকী উন্নয়ন করলেও মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের রামপুর লোকসভা কেন্দ্রের একটি গ্রামে জনসংখ্যা রয়েছে ২৩২২ জন। ঘটনাচক্রে সকলেই মুসলমান। এখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৫৩২টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে এই গ্রাম থেকে বিজেপি একটিও ভোট পায়নি। প্রকৃতপক্ষে সুদূরগামী লক্ষ্য নিয়ে মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। আর হিন্দুরা ভোট না দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে ৪০ শতাংশ হিন্দু ভোট দেয়নি কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পড়েনি। সুতরাং এখানেই বোঝা যায় হিন্দুরা কত উদাসীন আর মুসলমান ভোটাররা কত সচেতন। হিন্দু ভোট ৭/৮ শতাংশ অতিরিক্ত পেলেই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে পারবে এই কথাটি ভেবে দেখতে হবে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বলছেন, হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করা নাকি দুর্ভাগ্য এবং তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসার কথা বলেছেন। সহজেই অনুমেয় এই কথা বলার পিছনে মূল খেলাটি কী? তাঁর দলের নেত্রীর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না এবং বুদ্ধিজীবীরাও চুপ থাকলেন। কীসের ভয়ে?

শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের মনের কথা বলেছেন। তাঁর কথায় কর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছেন এবং অনেক হিন্দু সংগঠন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মুসলমানদের সঙ্গ দিলেও মুসলমানরা বিজেপির সঙ্গে নেই। তাই তিনি সেই কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বিগত লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনে বেছে বেছে হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। যারা ভোট দিতে পারেননি তিনি তাদের নিয়ে আন্দোলন ও ধরনা শুরু করেছেন। একটি বিশেষ পোর্টাল খুলে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে বলেছেন। শুভেন্দুবাবুর মন্তব্য ঘিরে রাজনীতির খেলোয়াড় ও সাংবাদিকরা শুভেন্দুবাবু ও সুকান্ত মজুমদারের মধ্যে বিভেদ টানার চেষ্টা করছেন। তবে সুকান্তবাবু একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনি সাংবিধানিক শপথ নিয়েছেন। তিনি দলের রাজ্য সভাপতি। সুতরাং তাঁর পক্ষে মন্ত্রী হিসেবে এই মন্তব্য প্রকাশ্যে সমর্থন করা সম্ভব নয় এবং এনডিএ সরকারের মৌলিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। সেদিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই সুকান্তবাবু ও দল দূরত্ব বজায় রেখেছে।

কিন্তু অনেকের অভিমত, শুভেন্দু অধিকারীর সাহসী মন্তব্য আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বিগত নির্বাচনে লক্ষ্য করা গেছে, দলমত নির্বিশেষে হিন্দু ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে যা এই নির্বাচনে বেশি করে পরিলক্ষিত হলো। সুতরাং আগামীদিনে হিন্দুদের ভোট দেওয়া চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বিগত নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট শতাংশ ক্রমশ কমেছে। কিন্তু সিপিএম বিজেপির পরাজয়ে বেশি খুশি। তাদের উদ্দেশ্য বিজেপিকে হারানো অর্থাৎ এদের গোপন খেলা প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-সহ কোনো মুসলমান দেশে মার্কসবাদের বীজ বপন করতে পারেননি? এরা বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হলে ভারতে প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু প্যালেস্টাইন, বাংলাদেশের সংরক্ষণ আন্দোলনের সমর্থনে ভারতে মিছিল বের করেন।

বাংলাদেশে স্লোগান উঠেছে 'ভারত যাদের মামার বাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।' তবুও বামপন্থীরা তাদের আন্দোলন সমর্থন করছে। এটি কী ধরনের দ্বিচারিতা? প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট ও মুসলমানদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে তা হলো উভয়েই ভোগবাদী। ভোগবাদ ছাড়া এদের কাছে দেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও দেশের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। সেজন্য ভোগবাদী আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের কাজ হাসিল করাই মূল লক্ষ্য। তাই দলমত নির্বিশেষে হিন্দুত্বের জাগরণ না ঘটালে ভবিষ্যতে বাঙ্গালির কপালে দুঃখ রয়েছে।

# স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দলগুলি স্বাধীনতার পর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

স্বাধীনতার লড়াই আমরাই করেছিলাম— এই মিথ্যাচারটাই বোধহয় বর্তমান জাতীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে জোরালো মিথ্যাচার। কংগ্রেস যে কতটা অস্তিত্ব সংকটে তার প্রথম প্রমাণ স্বাধীনোত্তর ভারত দেখেছিল ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে। সেদিন গোরক্ষার দাবিতে সাধু সন্ন্যাসীরা সংসদ ঘেরাও করলে চলেছিল জলকামান, গুলি। ইন্দিরা গান্ধীর তারপর শুরু ড্যামেজ কন্ট্রোলের। আমদানি হলো কংগ্রেসের গাই-বাছুর প্রতীক। কংগ্রেস অবনমন অপ্রাসঙ্গিকতার ওটাই ছিল প্রতিষ্ঠিত Watershed moment! ঐতিহাসিক আয়ান কোপল্যান্ড Hindu in Flux : Indira Gandhi and the 'Great All Party Campaign'-এ উল্লেখ করেছেন, 'A good case for the 1960 as a turning point can be made on the basis that it was the decade when the Hindu Right first made its mark in India as a political force...' স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেস যে আর স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস পার্টি নেই, তার পাকা দলিল তৈরি করেছিল ওই উল্লেখযোগ্য দিনটি। না হলে, স্বাধীনতার লড়াই করা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সাধু সন্ন্যাসীরা মুঘল বিরোধের মতো তীব্রতা প্রদর্শন করত না। একথা অস্বীকার করা যায় না, স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে ঊনবিংশ শতক, যাকে ঐতিহাসিক ড. অনিল শীল 'সমিতির যুগ' বলে উল্লেখ করেন, তারা কেউই জাতীয়তাবিরোধী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালির অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৮-এ রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে জমিদার সমিতি থেকে ১৮৪৩-এ নব্যবঙ্গের নেতারা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর দেখাদেখি তৈরি হলো মুম্বই অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), পুনের ডেকান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২), ও মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন, পুনে সার্বজনীন সভা (১৮৮৪) এবং অতি অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সভা (১৮৭৬)। সুরেন্দ্রনাথের ভারত সভা ছিল চাঁদের হাট। মূলত সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে যাদের যাত্রা তারাই ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন আন্দোলনকারী। অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রভাব সৃষ্টিকারী যদি কোনো নেতা থাকেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ। এতো প্রগতিশীল জাতীয়তাবোধে ঋদ্ধ মানুষের আন্দোলনের পরেও হঠাৎ জাতীয় কংগ্রেস তৈরি হলো কেন। এওতো জিজ্ঞাসা। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে দেশবাসী যখন গর্জন করছে, তখন শিক্ষিত ভারতবাসী অনুভব করছে ব্রিটিশ সরকারের নির্মম ষড়যন্ত্র। ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অধিকারের দাবিতে এক ছাতার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে। অর্থনৈতিক শোষণ ও ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে কী নৈরাশ্য। বিদ্রোহে উত্তাল দেশ। এইরকম এতটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, ঠিক তখনই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালন অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট ডাফরিনের আনুকূল্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে হিউম সামাজিক সংস্কার চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাফরিনের ইচ্ছে ছিল এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ।

১৭ মে ১৮৮৫, বোম্বের গভর্নরকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় হিউম কংগ্রেসের যৌক্তিকতা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের জন্মটাতেই কেমন যেন প্রাণ ছটফট করা অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। অনেক কিন্তু, কেন'র সমাহার। ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত-র মতে হিউম মৃদু আন্দোলনে শিক্ষিত ভারতীয়দের আবদ্ধ রেখে জন-বিদ্রোহের স্রোতে ভাটা আনতে চেয়েছিলেন। যার জন্মকালে রহস্য, বিতর্ক তাও তা জনমানসে ঠাঁই পেল, কারণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে Policy of association দরকার তার মঞ্চ হয়েছিল কংগ্রেস। আরও অদ্ভুত বিষয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হিউম সুরেন্দ্রনাথকে একরকম অগ্রাহ্য করেছিলেন। কংগ্রেস গঠন পরিকল্পনাকালে তিনি যখন ১৮৮৫-তে কলকাতা এলেন তখন ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে করলেন না। নভেম্বর শেষে যখন সুরেন্দ্রনাথ এই সংবাদ পান, তখন তিনি জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। এমনকী ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠীও মনে করেন হিউম ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই কাজ করেছেন। ইংরেজরা কি তবে এক 'সেফটি ভালভ্' হিসেবেই কংগ্রেসকে চেয়েছিল? এই শব্দ ১৯১৬-তে চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় নরমপন্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে কংগ্রেস এক আপোশকামী দল। স্বাধীনতার লক্ষ্যে সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়ালে কংগ্রেস তখন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংগঠিত মঞ্চ হয়। ১৯২০-তে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে তা দেশের সব স্তরের মানুষকে আহ্বান করে— রাজনৈতিক সচেতনতা এলিট ক্লাস ছেড়ে মাঠ ঘাট ময়দান ক্ষেত সর্বত্র ছড়ায়। কিন্তু গান্ধীর কংগ্রেসি মডেল এবং দেশবন্ধুর কংগ্রেসি মডেলে ভীষণ তফাত। প্রথমটা যদি আপোশ হয় দ্বিতীয়টা তবে আপোশহীন। 'নো-চেঞ্জার' বনাম 'প্রো-চেঞ্জার'-এর লড়াই প্রত্যক্ষ করল স্বাধীনতার পূর্ব-কংগ্রেস। তথাপি কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক স্বাধীনতা-সংগ্রামীর

> **একটা রাজনৈতিক দল নিজের অবস্থানে কতটা নীতি বলিষ্ঠ ও আবিলতাহীন —তা তার প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট প্রকৃতই এক বৃন্তে দুটি কুসুম যারা দ্বিচারিতা ও অন্তর্ঘাতের শিকড়ের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টাতেই তাদের টিকে থাকা।**

পরিচয়, ঠিকানা ছিল কংগ্রেস। ব্যানারের নামটুকুই কেবল কংগ্রেস যারা 'গান্ধীবাদ' রেখে রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু আদর্শে জারিত। কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও তোষণ জন্মলগ্ন থেকেই। কংগ্রেস ধন্য, কারণ তৎকালীন দেশ স্বার্থহীন মুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে মাথা উঁচু করে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই করছে। স্বাধীনতার পর ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ যখন হচ্ছে তখন স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ব্যানার কংগ্রেস ক্রমশ তার দ্বিচারিতা, মুসলমান তোষণের মাধ্যমে কালক্রমে কেবলমাত্রই এক ভোটব্যাংক সর্বস্ব রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত হলো।

আদর্শ, চরিত্র, ন্যায় বিচারের তোয়াক্কা রইল না। কংগ্রেস হয়ে উঠল জওহরলাল-ইন্দিরার পারিবারিক রাজনৈতিক দল। আজ যারা রাজনৈতিক মঞ্চে সুর চড়িয়ে বলে— আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। প্রশ্ন, এটা কোন কংগ্রেস? গান্ধীর নাকি দেশবন্ধুর? জওহরলালের, শাস্ত্রীজীর, ইন্দিরার, রাজীবের নাকি সোনিয়া-রাহুলের? স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মোট ৭০ বার ভাঙন হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস ভেঙে কখনও তৃণমূল তো কখনও তামিল মানিলা কংগ্রেস। এমন অসংখ্য আঞ্চলিক দল গড়েছে, ভেঙেছে, অবলুপ্ত হয়েছে। কতবার জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, শেষমেশ গতি না পেয়ে আবার নেতারা কংগ্রেসে আয়ারাম-গয়ারাম হয়েছে। যে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে কংগ্রেস মানে ছিল অখণ্ডতা, সংগঠিত শক্তি বা একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম সেই কংগ্রেস স্বাধীনতার পর যেই ভোটসর্বস্ব দল হলো— তারপর থেকে বারবার তার ভোট কমতেই থেকেছে। স্বাধীন দেশে কমিউনিস্ট বাড়বাড়ন্তের জন্যও কংগ্রেসকে দায়ী করা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ ভূমিকা ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ মহলেও চির চর্চিত। সোভিয়েত কমিউনিস্ট এজেন্ট দ্বারা (রহস্যজনক) তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের ভোল গেল বদলে। এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর চর্চার প্রাঙ্গণ। কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন (আজকের রাহুল কংগ্রেস অবশ্য চীনপন্থী) ও জাতীয় কংগ্রেসের মধুচন্দ্রিমা কাল আজও কাটেনি। ২০০৫-এ The Mitrokhin Archives II— যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেজিবি-র প্রভাব প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলিল; তা প্রকাশ পেতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সে কী প্রতিক্রিয়া! কেজিবি-র উঁকিঝুঁকি ভালোভাবে শুরু নেহরুর আমলেই 'Neither Nehru nor the IB realize how thoroughly the Indian embassy in Moscow was being penetrated by the KGB, using its usual varieties of the honey trap' (Mitrokhin, ৩১৩)। কেজিবি নিজেই স্বীকার করছে, ১৯৬৭-র নির্বাচনে তারা ৩০-৪০ শতাংশ ভোটব্যাংক প্রভাবিত করে (Mitrokhin ৩১৮)। ইন্দিরা গান্ধী-কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে সোভিয়েতের এক অভূতপূর্ব বন্ধন ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে সূক্ষ্ম কৌশলে কমিউনিস্ট সোভিয়েতের ঘরে বন্ধক রাখে। আজ কংগ্রেস-বামফ্রন্ট একে অন্যের জন্য নির্বাচনের টিকিট, আসন, মুসলমান ভোট শতাংশ বেচা-কেনা, মীমাংসা করে। সেই মীমাংসা মর্মে এরাজ্যে-ওরাজ্যে জোট হয়। বিগতদিনে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বোঝাপড়া আড়াল রেখে চলত, তখনও দুটি ভিন্ন দল রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও ভোটে প্রাসঙ্গিক ছিল। এখন সেটুকুও গেছে। জওহরলাল নেহরু-জ্যোতি বসু মিলে মিশে একাকার— রাজনৈতিক চেহারা-চরিত্রে কিংবা মুসলিম লিগের দেশভাগের দাবি সমর্থনে। এরাই দ্বিজাতিতত্ত্ব সমর্থন করতেন। তাই এদের রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছর পরেও সেকুলারবাদে মত্ত, আদতে এ দেশের মধ্যে ছদ্ম মুসলিম লিগ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত। এই দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি, অতিরিক্ত তোষণ কৌশল কংগ্রেসকে অতি অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। কমিউনিস্টদেরও হাস্যকর অবস্থানে উপনীত করেছে। সামান্য হলেও কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতেই হবে। ২০১৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পাঠচক্রের নোটে যথারীতি তারা যখন নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ১০০ বছরে পার্টি ক্যাডার-সমর্থকদের মোহিত করতে চাইল।

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে যখন মালাবার কায়ুর বিক্ষোভ (১৯৪৩), মহারাষ্ট্র ওয়ারলি জনজাতি অভ্যুত্থান (১৯৪৫), ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪২), বঙ্গে তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬) হয়েছিল, তাতে মানুষের অধিকার বোধের লহরী ছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলন সেই ইতিহাস ধরে যদি আজকেও প্রাসঙ্গিকতার টানাপোড়েন করে, তবে অজয় ঘোষ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, কল্পনা যোশীদের কপাল পুড়ছে আজকের দেউলিয়া কেরালা কমিউনিস্ট মডেলে। স্বাধীনতার আগে গদর পার্টির অনেক নেতাই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এমনকী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ পৃথ্বী আজাদ সিংহ থেকে বাবা সোহন সিংহ ভাকনা এমন অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির অংশ হন। ওটা ছিল ভারতকে মুক্ত করার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। সেই কমিউনিস্টরাই ডাইরেক্ট অ্যাকশানে নিষ্ক্রিয় ও নীরব থাকল। যারা শ্রমিকদের শোষণে নীরব রইলো, তারাই পার্টি কংগ্রেসে গণতন্ত্রের কথা বলে, সমাজতন্ত্রের কথা আওড়ায়, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি পাঠে মানুষকে দিনের পর দিন পিছিয়ে থাকাটা অভ্যাস করতে বলে। তাদের রুল বুকে বিশ্বায়ন মানে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দুত্ব মানে ফ্যাসিবাদ। কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতার বড়ো দিক হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্বেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের কোনো কর্মসূচি ছিল না।

'ড্রাফ্‌ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' নামে কর্মসূচির একটা খসড়া ১৯৩০-এ তৈরি হলেও তা চূড়ান্ত হয়নি। ১৯৫১-তে কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তা ১৯৫৬ পর্যন্ত অকার্যকর ছিল। তা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে চলতে ১৯৬৪ পর্যন্ত এগোয়। তারপর ২০০০-এ সময়োপযোগী কর্মসূচি রচনা হলো। যে কর্মসূচির শব্দ, ভাষা ও চিন্তার দীনতা কমিউনিস্ট গোঁড়ামিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। ধারা ৭-এর ২এ-তে উল্লেখ ছিল, '...এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।'

কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরির আহ্বান দেয় কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রযুক্তির আহ্বান করেনি, আধুনিকীকরণের আহ্বান করেনি। সংস্থা সংগঠনের আহ্বান করে, গণনাট্য চলে, কিন্তু তারাই ইংরেজি শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সবাইকে অগ্রাহ্য করে অগ্রাধিকার দেয় চে-গুয়েভারা, স্তালিন- লেনিনকে। এই মুশকিল আসান আর হলো না কমিউনিস্ট পার্টির। তাই তারা বলে, তারা দায়বদ্ধ। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী বলতে পারে কই? যারা গণবিপ্লবী পার্টি বলে দাবি করত তারাই আবার ২০১৫-র সালকিয়া প্লেনামের পর স্বীকার করে তাদের গণভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিনয় চৌধুরীর মতো মানুষের থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ঠিকানা যেদিন থেকে বদলে মজিদ মাস্টারদের কাছে গেছে, যেদিন থেকে বিনয় চৌধুরীকেও অজয় মুখার্জির মতো কোণঠাসা করেন জ্যোতি বসু, সেদিন থেকেই ওই দল তার ভবিষ্যৎ ও প্রাসঙ্গিকতার শেষ দিন গুণতে শুরু করেছে। রাজনীতিতে ভোটব্যাংক কর্তৃত্বের হিসেব দেয়। একটা রাজনৈতিক দল নিজের অবস্থানে কতটা নীতি বলিষ্ঠ ও আবিলতাহীন —তা তার প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট প্রকৃতই এক বৃন্তে দুটি কুসুম যারা দ্বিচারিতা ও অন্তর্ঘাতের শিকড়ের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টাতেই তাদের টিকে থাকা। □

# স্বাধীনতার পর স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের অগ্রগতি

কল্যাণ গৌতম

আকাশে ঘুড়ি ওড়ে, মনে হয় স্বাধীন সেই উড্ডয়ন, কিন্তু লাটাই যার, সে-ই আসলে উচ্চ-নীচ, উত্থান-পতনের কারিগর। তেমনই পুতুল নাচিয়ের দল। এক অদৃশ্য সুঁতোয় বাঁধা পুতুল, যেমন খেলায়, তেমনই খেলে। সর্বত্রই আসলে খেলা হয়। খেলা চলতে চলতে এমন খেলোয়াড়রা আসেন, যাদের দিশা ভিন্ন ও অনন্য, অসীমকালে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের ঝলকে ঝলকে পোষ্য পরাধীনতার বাঁধন ছেড়ার সাধন। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সেই প্রশাসনেরই ছিল অভাব। স্বাধীন অমৃত মহোৎসবে সেই তুল্যমূল্য বিচার আসবেই। দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণের জন্য সংহত কর্মকৌশলের জন্য অন্য দেশ বা জাতির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে কিনা।

একটি বহুল চর্চিত বিষয় ছোটো থেকেই শুনে আসছি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো পেলাম। সত্যিকারের স্বাধীনতা কি পেয়েছি? এখন 'সত্যিকারের স্বাধীনতা' কাকে বলে? স্বাধীনতা কি কেউ দয়া করে দেয়? 'দেখতে স্বাধীন, অথচ পোষ্য পরাধীন' দেশের সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যই-বা কী?

স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানান রাজনীতি করেছে সুদীর্ঘ কাল। বছরের পর বছর 'মুখেই জগৎ মেরেছে' কেউ। কেউ 'কাচের শিশি ভেঙেছে' বলে শিশুপাঠ্যে যোগ করেছে বাল্য-হাস্যরস, কেউ বলেছে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'; কারও তত্ত্ব আবার জোড়কলমের 'ডবল কসুম'! কেউ স্বাধীনতার বকলমে বিদেশি মতবাদের মনোবাঞ্ছা লাভ করতে উন্মুখ, আমলাতন্ত্রে কেউ জিইয়ে রাখতে চায় পছন্দের ইকোসিস্টেম। কেউ সুযোগ বুঝলেই দেশকে প্রভুদেশের কাছে 'বেচার' প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। কেউ ভয়ংকর দুর্ধর্ষ প্রতিবেশী দিয়ে নির্বাচনী সন্ত্রাসের জয়ের বৈতরণী পেরোতে চায়। কেউ আবার রসসিক্ত গণতন্ত্রের নামে ভেতরে ভেতরে নির্মাণ করে চলে 'চীনের প্রাচীর', রাশিয়ার রসায়ন, 'আরবি খেজুর' অথবা পাকিয়ে ওঠা পিত্তিরঙা পতাকা।

স্বাধীনতা মানে 'স্ব' বা অস্মিতার অভিব্যক্তি, আপন নিয়ন্ত্রণে থাকা, নিজের দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করা, আত্মনির্ভরশীল হওয়া। অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নিজের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আপন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে না পারলে কোনো দেশই স্বাধীন নয়। ভারতবর্ষ নামক দেশের যে মূল ভিত্তি, তার রচনাটি হচ্ছে আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত মানসচেতনার বোধ; সমগ্রকে ধারণ করে থাকার চৈতন্য। ভারতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত খোঁজ হয়তো পাওয়া গেল বিগত শতকের শেষ দশকের একদম শেষে। মাঝে এক দশকের নড়বড়ে আন্তর্জাতিক রিলেশনশিপ, তারপর পুনরায় আত্মনির্ভশীলতার অনুসন্ধান। সে অনুসন্ধান এখনও চলছে। প্রকৃতপক্ষে কোনও রাষ্ট্রনায়ক ও তার বৃহৎ সংসারকে খুঁজে দেখতে হবে, সে দেশ সত্যিই আত্মবোধে চলছে কি না। যদি একটিও জনবান্ধব ও সদর্থক প্রকল্প সাজাতে নিরন্তর বাইরের শক্তির সঙ্গে আপোশ করে চলতে হয়, তবে বাইরে থেকে 'স্বাধীন' দেখতে হলেও আসলে পরাধীন। নানান বিষয় ধরে ধরে আলোচনার সুযোগ আছে যে, স্বাধীনতার পরে ঠিক কখন ও কীভাবে ভারতবর্ষ 'অন্তরে বাহিরে' প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে অথবা প্রচেষ্টা শুরু করেছে। করোনা মহামারীর পরিস্থিতিই হয়তো চিনিয়ে দিয়েছে এ দেশ কতটা আত্মনির্ভরশীল। এই আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু যে কোনও একটি ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিবেচ্য বিষয়কে ভিত্তি করে আলোচনা করা যেতে পারে বই কী, তখন বোঝা যায় কী তার স্বরূপ। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিরক্ষা। প্রতিরক্ষার বিষয়ে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'আগে দিয়ে বেড়া, তবে ধরো গাছের গোড়া।' ভারতবর্ষ বৃহত্তর অর্থে একটি মালঞ্চ বা কুসুমোদ্যান। শ্রীময়ী উদ্ভিদ ও শস্যসম্ভার হচ্ছে দেশের সুনাগরিক, আর আতঙ্কবাদী-অনুপ্রবেশকারীরা উদ্যানের আগাছা। সীমান্তে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বেড়া দিয়ে এই দেশ বাঁচাতে হবে। বেড়া না দিলে যতই অমূল্য সম্পদ রচনা ও নির্মাণ করি না কেন, তা রক্ষা করতে পারবো না।

ভারত আজ কোনো দেশেরই চোখ রাঙানি মেনে নেওয়ার মতো দেশ নয়। দেশের সশস্ত্রবাহিনীর শৌর্যগাথা সমগ্র বিশ্বের সম্ভ্রম আজ আদায় করে নিয়েছে। সুনাগরিক মাত্রই বুঝতে পারছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থায়ী ও দৃঢ় হলে এবং সামরিক কর্তাদের প্রয়োজনীয় রসদ ও স্বাধীনতা দিলে পেশাদারিত্বের সঙ্গে অনেক ভালো কাজ করতে পারে দেশের সশস্ত্রবাহিনী। সেনাবাহিনীর হাতে আধুনিক অস্ত্র, সরঞ্জাম ও রসদের জোগানে কমতি রাখেনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার যদি সীমান্তে সন্ত্রাসের প্রশ্নে আপোশহীন হয়, তবেই দেশ স্বাধীন থাকতে পারে। ২০১৬ সালে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে অভিযান, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়ার ভেতরে বালাকোটে জঙ্গিঘাঁটিতে অভিযান সম্ভব হয়েছে সরকারের সেই আপোশহীন মনোভাবের জন্যই। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সীমা লঙ্ঘনের বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারত। বুঝিয়ে দেওয়া

> **অমৃতকালের জন্য ভিত গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারত। তার বাজেটগুলির দিশাও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত। ইতিমধ্যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। জি-২০-র সভাপতির পদের দায়িত্ব পেয়ে হয়েছে আরও আত্মপ্রত্যয়ী।**

হয়েছে যে কোনো প্ররোচনার মোকাবিলা দৃঢ়ভাবে করতে সক্ষম এই দেশ।

স্বাধীনতার পরই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ কমানোর ফলেই পঞ্চাশের দশকের শেষে ভারতীয় সেনাকে উত্তরের প্রতিবেশী দেশের মুখোমুখি হতে হলো। তখন ভারতের সেনাবাহিনীর হাতে ছিল না পর্যাপ্ত অস্ত্র, রসদ ও প্রয়োজনীয় সৈন্যবল। দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে গেলে সৈন্যবাহিনীর হাতে থাকতে হবে আধুনিক অস্ত্রসম্ভার, সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্য। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হলেন। কারণ দিনের পর দিন 'ঠুকঠাক', একবার মস্ত 'এক ঘা' না দিলে চলে না। আর সীমানায় দাঁড়িয়ে অনন্ত ঠুকঠাক মেনে নেবই-বা কেন? এতে তো দেশের ভেতরে বসবাসকারী 'দেশবিরোধী শক্তি'র স্পর্ধাই বাড়ে, যারা নিতান্ত বাইরের লোকজনের হাত ধরে দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চায়। ঐতিহাসিকভাবেই তারা এদেশে রয়ে গেছে। সীমান্তে তাই মাঝে মধ্যে যোগ্য জবাব দিলে আতঙ্কবাদী আর স্লিপার সেল বুঝে যাবে, তাদের সমঝে চলতে হবে। এই আবহেই তিন বাহিনীর জন্যই বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে সরকার। চিরাচরিত ও অচিরাচরিত উভয় দিক থেকেই সমুদ্রপথ দিয়ে নতুন বিপদের সম্ভাবনা অনুভূত হওয়ায় নৌবাহিনী ও উপকূল বাহিনীর জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়। সমুদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাতেও আজ সক্রিয় এই দেশ। ভারত মহাসাগরে চীনের নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার বিরুদ্ধে ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক প্রকৃত সার্বভৌম দেশের মতোই ইতিবাচক।

নজিরবিহীন উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে সশস্ত্রবাহিনীর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তিচালিত সংগঠন রচনার কাজ। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ ও দৃঢ় হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের কল্যাণে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট সংযুক্ত বস্তুর মাধ্যম তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ দূরত্ব থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ আজ আর অসম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় নজরদারি দেশ আজ করতে পারছে।

২০১৯ সালে প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান (Chief of Defence Staff) পদ এবং সামরিকবিষয়ক দপ্তর তৈরির ঘোষণা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, যা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরে বড়ো সংস্কার। বিবিধ স্তরের মধ্যে সমন্বয় দরকার ছিল। নির্দেশদান, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ, পরিষেবা, রসদ জোগান ইত্যাদির উদ্যোগেও কাজ করবার অভাব ছিল, আজ তা দূর হয়েছে। আজ সশস্ত্রবাহিনী এগিয়ে চলেছে আত্মনির্ভর ভারত কর্মসুচির মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মযজ্ঞকে জোরদার করতে আজ নেওয়া হয়েছে বহু পদক্ষেপ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছে নানা সহায়তা, সুযোগ। এমনকী ডিআরডিও-র পরীক্ষাগারও উন্মুক্ত পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে।

ভারতে যে মজবুত আর্থিক ক্ষেত্র রচিত হয়েছে, তা সুলভ ঋণদানের দক্ষ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে সক্ষম। সেই লক্ষ্যেই আজকের ডিজিটাল পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে গবেষণায় জোর এবং দক্ষকর্মীর জোগান ব্যবস্থা। উৎকৃষ্ট শিক্ষার নাগাল পেতে এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের স্বাধীনতা।

জি ২০-তে ভারতের সভাপতিত্বই প্রমাণ করেছে নেতৃত্ব নিতে পারা একটি দেশ জলবায়ুর পরিবর্তন, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রযুক্তিপ্রয়োগে বিশ্বব্যাপী কতটা ন্যায়নিষ্ঠ এবং পক্ষপাতহীন চ্যালেঞ্জ নিতে পারে এবং ঐক্যমত গড়ে তুলতে পারে। টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশ একটি মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ। পরনির্ভরশীল কোনো দেশের পক্ষে এইরকম নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভবই ছিল না। জি ২০-তে ভারতের নীতি বসুধৈব কুটুম্বকম— এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ।

একটি যথার্থ কৃষিভিত্তিক স্বাধীন দেশের মতোই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কবচের বহু ব্যবস্থা রেখেছে ভারত। কারণ এদেশের অর্থনীতিতে মোট মূল্য সংযুক্তিতে কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধানমন্ত্রী সফল বিমা যোজনা, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা— জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন ইত্যাদি রচিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলির দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে। অটল উদ্ভাবন অভিযানে সুযোগের বৈষম্য দূর করতে চায় এই সরকার। জরুরি অনুঘটক হয়ে পালটে গিয়েছে ভারতের সড়ক পরিকাঠামো যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সাম্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তায় গ্রামের পথ গিয়েছে জুড়ে। এমন স্বাধীনতাই তো ভারতবাসী দেখতে চেয়েছে দশকের পর দশক। অবশেষে তা পাওয়া গেল। সড়কপথের দৌলতে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হলো। বেড়েছে রেল পরিকাঠামো। ভারতীয় রেল একটি জাতীয় রেল পরিকল্পনা এনআরপি-২০৩০ প্রস্তুত করেছে যাতে জনগণের বাহন হয়ে রেলের মাধ্যমে কম খরচে মোট পণ্য পরিবহণের ৪৫ শতাংশ অনায়াসে পৌঁছে যাবে।

মহাকাশ গবেষণাতেও স্বাভিমানের ছোঁয়া। যে মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলি মঙ্গলের কক্ষপথে উপগ্রহ পাঠাতে পেরেছে তাদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে ঢুকেছে ইসরো। ভারতের চন্দ্রাভিযান মোটের উপর সফল, যেখানে জানার উপায় আছে চাঁদের বিবর্তন, চাঁদের মধ্যে বিভিন্ন খনিজ, চাঁদের মেরু অঞ্চলে জলের অণুর সন্ধান। গগনযান কর্মসূচিতে (২০১৮) মহাকাশের রহস্য উন্মোচণের নতুন পর্যায়ে ভারত। গঠিত হয়েছে 'হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট সেন্টার' (২০১৯)। সফলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে মানবযান উৎক্ষেপনের 'প্যাড অ্যাবর্ট টেস্ট' যাতে উৎক্ষেপণ স্থলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মহাকাশচারীদের বাইরে বের করে আনা যায়। দেশের মহাকাশ অর্থনীতি মজবুত করতে এবং মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সহায়তা ও অনুমোদন দিতে গঠিত হয়েছে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেশ প্রোমোশন অ্যান্ড অথোরাইজেশন সেন্টার'। গগনযান কর্মসুচি, চন্দ্রযান, আদিত্য-এল-১, সৌরমণ্ডল অভিযান, শুক্র অভিযানের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে ইসরো। যে কর্মসুচিগুলি নিয়েছে তা একুশ শতকের মহাকাশ গবেষণায় ভারতের অবস্থানকে মজবুত করেছে।

অমৃতকালের জন্য ভিত গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারত। তার বাজেটগুলির দিশাও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত। ইতিমধ্যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। জি-২০-র সভাপতির পদের দায়িত্ব পেয়ে হয়েছে আরও আত্মপ্রত্যয়ী। আগামী ২৫ বছরের যাত্রাপথে সে জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে চায়। □

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার অবদান একটি মাইলফলক

**সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী**

চতুর্দশ শতকে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের রচিত গ্রন্থ রাজমালাতে ত্রিপুরার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজবংশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিল। প্রায় ২৫০০ বছর ধরে ১৮৬ জন রাজা এই রাজ্য শাসন করেছেন বলে জানা যায়। ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরা ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১৯৭২ সালে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

ভারতকে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের চরম উন্নাসিকতা, অবহেলা, শোষণ-উৎপীড়ন, নীল চাষে বাধ্য করা-সহ অর্থনৈতিক অবহেলার কারণে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারই সূত্র ধরে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন ত্রিপুরার আপামর জনগণ স্বাধীনতার চেতনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাতে বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ছোঁয়া লেগেছিল। প্রভাব পড়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেরও। ফলে, গড়ে উঠেছিল 'অনুশীলন সমিতি'র শাখা। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে একসময় বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরা। সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিপ্লবীদের অস্ত্রের মহড়াও চলতো ত্রিপুরার গহীন জঙ্গলে ও পাহাড়ে। ক্রমান্বয়ে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ত্রিপুরায়। রাজ্যটির বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীরা সংঘটিত হয়ে বেগবান করে তোলে অসহযোগ আন্দোলন। যুগান্তর পার্টির ভাবাদর্শে গড়ে উঠে 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ'। এখানে বিপ্লবীদের তৎপরতা চলতো গোপনে।

*অনাদি রঞ্জন সেন*

একই সময়ে এখানে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৪২-৪৩ সালে ত্রিপুরায় রতনমণির নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া জনজাতি রিয়াং বিদ্রোহকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রতনমণির অনুগত শিষ্য বিদ্রোহীদের সে সময়ে স্বদেশি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেরও ছোঁয়া লেগেছিল পার্বত্য ত্রিপুরায়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে রাস্তা যোগাযোগের করিডোর হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এই পথ দিয়ে যাবার সময় বিদ্রোহীদের ত্রিপুরার জনজাতিরা সক্রিয় সহযোগিতা করতো। খাবার জল, ফল ও পাহাড়ি জুমের খাবার নিয়ে তারা পথে পথে অপেক্ষা করতো। সিপাহীদের খাবার ও আশ্রয় দিয়ে জনজাতিরা খুশি হতেন।

ত্রিপুরার রাজারাও কেউ কেউ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও রাখিবন্ধন উৎসবের প্রভাব পড়েছিল। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সংবাদে রাজপরিবারের অনেকেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তদানীন্তন রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও এর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। বঙ্গের চারণ কবি মুকুন্দ দাস আগরতলায় এসে গান গেয়ে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করেছিলেন ত্রিপুরার মানুষকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া 'অনুশীলন সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পার্বত্য ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনিয়ায় দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুইটি বাইরে থেকে দেখতে খামার বাড়ির মতো মনে হওয়ার কারণে কেউ তেমনটা বুঝে উঠতে পারতেন না। সেখানে দিনে চলতো কৃষি চাষবাস ও পশু পালন, আর রাতে নিকটবর্তী জঙ্গলে

*অমর কৃষ্ণ সরকার*

*ব্রজেন্দ্র কুমার দাস*

*কাঞ্চনপ্রভা দেবী*

*মহেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী*

চলতো অস্ত্র প্রশিক্ষণ। বিপ্লবীরা অনেক সময় পালিয়ে এসে ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিতেন। তখন স্থানীয় জনজাতিরাও এদের আশ্রয় দিয়ে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করত। আর এইভাবে ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য। বিপ্লবীদের প্রতি রাজার গোপন সহানুভূতি ছিল বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রায়শই ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো। ক্রমান্বয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশিদের তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, বেগবান হয়ে উঠেছিল অসহযোগ আন্দোলনও।

চাঁদপুরে করিমগঞ্জের চরগোলার অসহায় চা শ্রমিকদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের হামলার প্রতিবাদে যে রেল ধর্মঘট হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে আখাউড়ায় হরতাল পালিত হয়। আগরতলায় বাজার বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। যার কারণে বিলোনিয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহরে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় যাতে এ ধরনের তৎপরতা, সভা-সমাবেশ না হতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ত্রিপুরার রাজপ্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরোধিতার কারণে ব্রিটিশের এই চক্রান্ত ভেস্তে যায়।

সরকারি বিচার ব্যবস্থাকে বয়কট করার উদ্দেশে কৈলাসহরে একটি ধর্মসভা স্থাপিত হলে ত্রিপুরা সরকার তা বন্ধ করে দেয়। তাতেও সংগ্রামীরা থেমে থাকেননি। তারা ত্রিপুরার সর্বত্র প্রতিবাদ সংগঠিত করে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোগী অনন্ত সিংহ সম্ভবত ১৯২২ সালে আগরতলায় রাজপ্রাসাদের অস্ত্রাগার থেকে উমেশলাল সিংহ-সহ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রচুর পরিমাণে পিস্তলের গুলি সংগ্রহ করেন বলে জানা যায়।

আগরতলায় অনুশীলন সমিতির যে শাখা স্থাপিত হয়েছিল তার প্রধান কাজ ছিল ব্রিটিশ এলাকা থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে আসা বিপ্লবীদের ত্রিপুরায় আশ্রয় দান-সহ গোপন যোগাযোগে সহায়তা করা। অনুশীলন সমিতির তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সমিতির সদস্যদের কয়েকজনকে বন্দিও করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে ত্রিপুরায় শরীর চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চার নামে 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ' গঠিত হলেও মূলত এটি ছিল ত্রিপুরায় বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয় ও অনুশীলন কেন্দ্র। সে সময়ে 'যুগান্তর পার্টি'র ভাবাদর্শে গঠিত এই সঙ্ঘের শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যের সর্বত্র। প্রকাশ্যে সমাজসেবামূলক কাজ করলেও গোপনে ছিল তাদের বিপ্লবী তৎপরতা। দূরবর্তী স্থানে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এ সকল কর্মকাণ্ডের জেরে ত্রিপুরার বিপ্লবীদের অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আন্দামানের সেলুলার জেলেও বন্দি রাখা হয়েছিল।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মিমিত্তে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার সীমান্তের ৭৫টি গ্রামের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সূত্রমতে এই গ্রামগুলির নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম অনুসারে ইতিহাস, এখানকার মানুষের সংস্কৃতি এবং সাফল্যকে তুলে ধরার কারণেই এই নাম বদল করা হচ্ছে। আরও জানা যায়, গ্রামগুলিতে ৭৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তিও বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ত্রিপুরার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয় বিশ্বাসের পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ১৮৮৫ সালে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা করার সময় ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর আইনগত দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তাঁকে ত্রিপুরায় একটি আদালত স্থাপনের অনুরোধ করেছিলেন, যার ফলে উদয়পুরের খিলপাড়ায় ত্রিপুরার প্রথম আদালত স্থাপিত হয়েছিল। এই পরামর্শের বিনিময়ে মহারাজা দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাসকে উদয়পুর এবং আশেপাশে বিশাল জমি দান করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর বিনয় বিশ্বাস উদয়পুর আদালতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ৪ নভেম্বর, ১৯৯২-এ বিরাশি বছর বয়সে উদয়পুরে পরলোকগমন করেন, যা এখন ত্রিপুরার গোমতী জেলার অংশ হিসেবে পরিচিত।

সমগ্র ভারতের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে অনন্য অবদান রেখেছে। ত্রিপুরার সংগ্রামীরা এখানকার জনসাধারণকে একত্রিত করতে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ অব্যাহত রাখতে আইন অমান্য, ভূমিগত আন্দোলন নিরলস সমর্থনের মাধ্যমে, ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি অমোঘ স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরাও স্বাধীনতার লড়াইয়ে অনেক অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা লোকগান, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য এবং স্থানীয় শিল্পকলায় মানুষকে উদ্দীপিত করেছেন।

আজ, যখন আমরা আত্মত্যাগ এবং অর্জিত বিজয়গুলির পর্যালোচনা করি, তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার ভূমিকাকে স্বীকার করা এবং স্মরণ করা অপরিহার্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার ভূমিকাও অপরিসীম। তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ত্রিপুরার অবদান ছিল একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ত্রিপুরার প্রতিটি অঞ্চল স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সফলতার চিহ্ন রেখে গেছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগের কারণে ত্রিপুরায় নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লকের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল এবং অনেক ত্রিপুরী যুবক ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীতে (আইএনএ) যোগদান করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি সঞ্চারিত করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার সংগ্রামীদের মধ্যে উপেন্দ্র কুমার দত্ত, শচীন্দ্রলাল সিংহ, জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, অনন্ত সিংহ, যোগেশ চক্রবর্তী, অখিল দত্ত-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। যাদের মধ্যে মহারানি কাঞ্চনপ্রভার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মতো ত্রিপুরার অনেক গুণী ও সাহসী মহিলা স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা সদস্য সংগ্রহ এবং সময়ে সময়ে বিক্ষোভে ও চোরাগুপ্তা হামলায় অংশগ্রহণ করে বিপ্লবীদের সার্বিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী মহারানি কাঞ্চনপ্রভার একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের উরিছড়ায় এখনো স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজ্যের অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ☐

# চিকিৎসকরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী

**ডাঃ কনক চৌধুরী**

পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'এবারের স্বাধীনতা দিবসে ভারত নিজের স্বাধীনতার পাঁচাত্তর বছর পূর্ণ করবে। আমরা সবাই এক অভুতপূর্ব আর ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছি। এ এক বড়ো সৌভাগ্য ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আপনারাও ভাবুন, যদি আমরা দাসত্বের পর্বে জন্ম নিতাম, তাহলে এই দিনের কল্পনা আমাদের জন্য কেমন হতো? দাসত্ব থেকে মুক্তির সেই আকুলতা, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সেই ব্যাকুলতা— কতটা ব্যাপ্ত ছিল। সেই দিন, যখন আমরা, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে, সংগ্রাম করতে, আত্মবলিদান দিতে দেখতাম।' ৯১তম 'মন কী বাত' আলোচনা পর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই কথাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এটা খুব সত্যি যে ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের অমৃত মহোৎসবে দাঁড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি এই স্বাধীনতার ভিত কোনো একক সাফল্যের সোপান নয়। জানা অজানা হাজারো মানুষের জাগরণ, ক্রমাগত চেষ্টা, দেশপ্রেম, নির্মোহ কর্ম ও আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই এসেছিল স্বাধীনতা। আজ স্বাধীনতার অমৃতকালে দাঁড়িয়ে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে চাইছি সেইসব মহৎপ্রাণদের যাঁরা ডাক্তারি পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য দিনরাত কাজ করেছিলেন। তাদের কারও নাম জানা, কেউ রয়ে গেছেন অজানা। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন শুধু বন্দুক দিয়ে নয়, দেশের শিক্ষা, সচেতনতা ও কর্মসংস্কৃতি যখন জাগবে, তখনই দূর হবে অন্ধকার। কাটবে ঔপনিবেশিকতার মানসিকতা।

১৮৫৭ সাল। মহাবিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ভারতজুড়ে। কানপুর, ব্যারাকপুর পেরিয়ে তার রেশ এসে পৌঁছল সিলেটে। এদিকে বিপ্লবের খবর শুনে গ্রামের সাধারণ বাসিন্দারা পরিবার নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করলেন। সিলেটের কালেক্টরের দেওয়ান স্বরূপচন্দ্র দাস তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে জীবন বাঁচাতে একই পন্থা নিলেন। নৌকায় উঠে অন্যত্র যাওয়ার সময়ই জন্ম হয় সুন্দরী মোহন দাসের। অকূল পাথারেই শুরু হয় জীবনযুদ্ধ। যত বড়ো হতে লাগলেন, মনের মধ্যে জন্ম নিল সাহস, জন্ম নিল দেশের জন্য কিছু করার ব্যাকুলতা। সিলেট (তৎকালীন শ্রীহট্ট) থেকে প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে চলে আসেন কলকাতায়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ, তারপর পাশেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ। আর তখনই বৃহত্তর গণ্ডিতে পা রাখলেন সুন্দরী মোহন দাস। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেখেছিলেন পরিস্থিতির পরিবর্তন। বুঝলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শুধু নীতি নির্ধারণ আর বন্দুক হাতে নেমে পড়লেই হবে না। যদি আঘাত আনতেই হয় তাহলে দেশীয় শিক্ষা, শিল্প, প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

ডাঃ নীলরতন সরকার

১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়। শুধু বঙ্গপ্রদেশ নয়, সমগ্র দেশের ভেতরেই একটু একটু করে বাড়ছে স্বাধীনতার চেতনা। প্রস্তুত হচ্ছেন মানুষ। মূলত দেশপ্রেমের ভাবনা থেকেই স্বদেশি ভাবধারা তৈরি হয়েছিল সুন্দরী মোহন দাসের হৃদয়ে। এই সময় তরুণ সুন্দরী মোহনের আলাপ হলো আরও দুজনের সঙ্গে— বিপিনচন্দ্র পাল ও আনন্দমোহন বসু। সবাই লাল-বাল-পাল'কে চেনেনই। ডাঃ সুন্দরী মোহন এই তিন বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখতেন। সবাই মিলে তখন অংশ নিচ্ছেন হিন্দু মেলায়। এদিকে কলকাতার একটি বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি তখন ব্রাহ্ম সমাজের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁর সামনেই এবার শরীরের রক্ত দিয়ে সুন্দরী মোহন লিখলেন প্রতিজ্ঞাবাক্য, দীক্ষিত হলেন স্বদেশি মন্ত্রে— 'কখনোও ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করব না। দেশসেবাই হবে জীবনের আসল লক্ষ্য।' কিন্তু ইতিহাসের পাতায় বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য সুন্দরী মোহন দাসের নাম পাওয়া যাবে

ফঃ ৩

না। তিনি ছিলেন বঙ্গের আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের পথিকৃৎদের অন্যতম। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে যখন ফিরে এলেন সিলেটে, তখনও চেষ্টা করছেন ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তার ঘটানোর।

চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ চালুরও চেষ্টা করেন। স্থানীয়রা তো বটেই, নিজের পরিবারও মেনে নেননি সুন্দরী মোহনের এই পদক্ষেপ। বাড়ি ছাড়েন তিনি। সকলের মনে আছে বিংশ শতকের শুরুতে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর কথা। ঝড়ের গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ভয়াবহ রোগ। তখন কলকাতা কর্পোরেশনের হেলথ ইনস্পেক্টরের দায়িত্বে ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস। অবশ্য ব্রিটেনের রানির শাসকদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় পদত্যাগও করেন তিনি। কিন্তু সেই সময়ই 'মিউনিসিপাল দর্পণ' নামে একটি বই বের করেন তিনি। কয়েক বছর আগে একইভাবে বের করেছিলেন 'সরল ধাত্রীশিক্ষা'। দুটি বইয়েরই মূল উদ্দেশ্য ছিল, সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে বঙ্গের মানুষদের আরও সচেতন করা। বিশেষ করে প্লেগের সময় তাঁর 'মিউনিসিপাল দর্পণ' বহু মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই অবশ্য স্বদেশি ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে থাকে।

সেই ভাবনার ফল বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট; যা আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে গোটা পৃথিবীতে পরিচিত। সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যুক্ত ছিলেন ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস। তরুণ, কর্মহীন যুবকেরা যাতে নিজেদের পরিশ্রমে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে, সেই চেষ্টাও করেছিলেন বরাবর। তৈরি করেছিলেন দেশীয় ওষুধের কারখানা। কখনো ডাক্তারি ছাড়েননি। নিজের এত ব্যস্ততার পাশাপাশি দায়িত্ব ভোলেননি তিনি। 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' তৈরির ক্ষেত্রে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন, তেমনই তৈরি হওয়ার পর হয়েছিলেন সেখানকার প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় চলছিল অসহযোগ আন্দোলন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রতিবাদী ছাত্ররা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাদের প্রয়োজন ছিল একটি দেশীয় মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের। এই ভাবনাটি নাড়া দেয় ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসকে। শুরু হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের কাজ। নিজেকে উজাড় করে দেন তিনি। প্রায় একা হাতে একটু একটু করে দাঁড় করান এই প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায় থেকে ৯২ বছর বয়সে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত সুন্দরী মোহন ছিলেন একজন আপাদমস্তক স্বদেশি। পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করেননি ঠিকই; কিন্তু যে কাজ করে গেছেন সারাজীবন ধরে, অন্তত সেজন্য তাঁকে শুধু বিপ্লবীই নয়, আখ্যায়িত করতে চাই সমাজসংস্কারক ও দেশমাতৃকার অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে। নিজের রক্তে যে শপথবাক্য লিখেছিলেন, তা পালন করে গেছেন সারাজীবন।

আমরা সবাই জানি, ১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন। এই দিনটিকে আমরা জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালন করি। সত্যিকার জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করার জন্য উদযাপিত হয় যিনি একজন চিকিৎসকও ছিলেন। এই দিনটির পেছনের ধারণাটি হলো চিকিৎসকদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগানো। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একজন উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক এবং রাজনীতিবিদও ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৮২ সালে তিনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচিত হয়েছিলেন, তবে তিনি ডাক্তারিই বেছে নিয়েছিলেন। ডাঃ রায় প্রাদেশিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় যোগদান করেন, নিষ্ঠার সঙ্গে রোগীদের সেবা করেন। এরপর তিনি আরও পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেন্ট বার্থোলোমিউ'স মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য ইংল্যান্ডে যান, সেই ইন্সটিটিউটের অ্যাকাডেমিক ডিন বিধান চন্দ্র রায়ের জাতি এবং উৎসের কারণে তার আবেদন বহুবার প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে ভর্তি করার আগে। দুই বছরের মধ্যে তিনি এমআরসিপি এবং এফআরসিএস সম্পন্ন করেছিলেন এবং অবিলম্বে ১৯১১ সালে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি ভারতে থাকাকালীন নিবেদিতভাবে জাতির তথা রোগীর সেবা করেছিলেন, যাদবপুর টিবি হসপিটালের মতো অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, কমলা নেহরু হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন।

১৯২৫ সালে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় রাজনীতিতে যোগ দেন, এমনকী নির্বাচনে জয়লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তিনি পরাজিত করেন এবং আইন পরিষদে একটি আসনে জয়লাভ করেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। সমাবেশ বেআইনি ঘোষণা করায় তিনি আলিপুর জেলে বন্দি ছিলেন। তিনি তার শাসনামলে উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা সহায়তা ও পয়ঃপ্রণালী এবং নাগরিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পর, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পদে ১৪ বছর দায়িত্ব পালন করেন, সেই সময়ে তিনি রোগীদের সেবাও চালিয়ে যান, যা বর্তমান সময়ে অকল্পনীয়! স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের অমৃত মহোৎসবে দাঁড়িয়ে এইসব মহৎপ্রাণের কাহিনিতে সুস্পষ্ট ভাবে ধারণা করা যায় যে চিকিৎসকরা জনগণ ও জাতির সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই নিজেদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন!

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের অগ্রগামীদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি। যিনি অরবিন্দ ঘোষ ও বাঘা যতীনের মতো বঙ্গের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের আত্মবলিদানের পর একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল যুগান্তরের নেতা হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশরা কুড়ি

হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশের বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় তাকে ধরতে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যর্থ হয়। ১৯২৩ সালে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তাঁকে বঙ্গ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি রাঁচিতে থাকতেন, যেখানে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে তিনি আবার জেলে যান। স্বাধীনতার পরে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জিকে রাজ্যপাল পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যাদুগোপাল রাঁচির জনগণের সেবা করাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কী যাদুই না জানি ছিল এই মহৎপ্রাণ হৃদয়ের অতল গহ্বরে!

সেই সময় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছিলেন যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্য। শ্রীঅরবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ডিগ্রির পর ডাক্তারজী নাগপুরে ফিরে আসেন। তিনি ডাক্তারি পেশায় না থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার এত বছর পরেও প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সম্পর্কে তথ্য জনসাধারণের কাছে এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ফোরামে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু সামান্য তথ্য পাওয়া যায় তা একটি স্টিরিওটাইপ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে মনে হয়। একটি সত্য ইতিহাসের যৌক্তিক প্রতিফলন কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস দ্বারা লালিত ইতিহাসবিদরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী জাতীয় আইকনের অবদানের ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো একটি সংগঠন, যেটি অন্য যে কোনো সংগঠনের চেয়ে আসলে বেশি খোলামেলা, অথচ দুঃখজনকভাবে একটি গোপন সংগঠন হিসেবে চিত্রিত হয়েছে এবং বার বার দেখানো হয়েছে কীভাবে তিনটি ভিন্ন আঙ্গিকে এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘের অবদানকে খর্ব করার জন্য বাম ও কংগ্রেসের ইতিহাসবিদরা একে অপরের সঙ্গে এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। যদিও ডাঃ হেডগেওয়ার গান্ধীজীর খিলাফতের সঙ্গে করে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার নীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কারণ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে খিলাফত পুনরুদ্ধার করা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে জনসম্পর্ক ও সভাসমিতে ভাষণ দিতে থাকেন। ১৯২১ সালের মে মাসে তিনি মহারাষ্ট্রের দুটি স্থানে তার আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। এই মামলার শুনানি

ডাঃ ভাউ দাজি লাড

ডাঃ আর জি কর

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

১৪ জুন, ১৯২১ তারিখে শুরু হয়। আদালতে বিচারক হিসেবে ছিলেন ব্রিটিশ বিচারক স্মেলি। ডাঃ হেডগেওয়ার আদালতে তার বিবৃতি পড়ে শোনান। বিবৃতি শোনার পর বিচারক স্মেলি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'তার আত্মপক্ষ সমর্থন তার মূল বক্তব্যের চেয়েও বেশি রাষ্ট্রদ্রোহী'!

১৯ আগস্ট ১৯২১ তারিখে দেওয়া বিচারক তার রায়ে ডাঃ হেডগেওয়ারকে লিখিতভাবে একটি অঙ্গীকার দেওয়ার আদেশ দেন যে তিনি ভবিষ্যতে এক বছরের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তৃতা দেবেন না এবং তিন হাজার নগদ টাকা জামিন দেবেন। ডাঃ হেডগেওয়ার জামিনের আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। বিচারক তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ১৯২২ সালের জুলাই মাসে তিনি আজনি জেল থেকে মুক্তি পান। সেই সময় কংগ্রেস কর্তৃক একটি সংবর্ধনা সভা আয়োজন করা হয় যেখানে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতা মোতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খানও ভাষণ দেন। এখন প্রশ্ন হলো, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ার সময় কোনো শিক্ষার্থী কি কোনো শিক্ষাঙ্গনে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে জানতে পেরেছে বিগত পঁচাত্তর বছরে?

ডাঃ টি এস সুন্দর রাজন ছিলেন চিকিৎসা পেশার আরেকজন বীর সেনানী। তিনি মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকে যুক্ত হয়েছিলেন স্বদেশি আন্দোলনে যুক্তরাজ্যে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার ইন্ডিয়া হাউসে বীর সাভারকরের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছেন তিনি। ভারতে ফিরে আসার পর মাদ্রাজে রাওলাট আইন সত্যাগ্রহ, খিলাফত আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি নিম্ন বর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মজবুত মাইলফলক ডাঃ টি এস সুন্দর রাজন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর রাজন তামিলনাড়ু সরকারের মন্ত্রী হয়েছিল।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, জননেতৃত্ব, যোগাযোগ ও জনসচেতনতা জাগ্রত করায় একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে

ডাক্তারদের অবস্থান সমাজে জোরালো, কারণ চিকিৎসকরা নিজেদের পেশায় ব্রতী থেকেও আমাদের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং বহুমুখী সামাজিক মনস্তত্ত্বকে আকৃষ্ট করে। ডাঃ ভাউ দাজি লাড বা ডাঃ রামচন্দ্র বিঠল লাড গোয়ার একটি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন, কিন্তু ভাউ, যেহেতু তাকে স্নেহের সঙ্গে এবং সম্মানের সঙ্গে ডাকা হতো তার প্রতিভা দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। বোম্বাইয়ের তৎকালীন গভর্নর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, ডাঃ ল্যাড এসফিনস্টোন কলেজে ভর্তি হন, যার পরে তিনি ১৮৫১ সালে গ্র্যান্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক হওয়া কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তারপর তিনি নেডিক্যাল কলেজে যোগদানের আগে কয়েক বছর সেখানে শিক্ষকতা করেন। অনুশীলন করা তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে। তিনি কুষ্ঠ রোগের বর্ণনা এবং নিরাময়ের জন্য তাঁর বাড়িতে বিশাল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি Hydnocarpus inebriens বা সাধারণত কাউটি নামে পরিচিত গাছটিকে অন্য কিছুর সঙ্গে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেন এবং তাঁর অনেক রোগী এই চিকিৎসা থেকে অভূতপূর্ব উপশম লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

ভাউ তার চিকিৎসার পরিকল্পনা, রোগীদের লক্ষণ এবং উপশম যত্ন সহকারে নথিভুক্ত করেছিলেন। উজ্জ্বল চিকিৎসা পেশা ছাড়াও ভাউদাজি লাড জনগণের কল্যাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং ভারতীয়দের স্ব-শাসনের প্রথম প্রচেষ্টার অংশ ছিলেন। তিনি দাদাভাই নওরোজি এবং জগন্নাথ শঙ্কর শেঠের মতো উজ্জ্বল ব্যক্তিদের দলের অংশ ছিলেন যারা ১৮৫২ সালে বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। ডাঃ লাড একটি সংবিধান এবং আরও স্বচ্ছ শাসনের দাবিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি পিটিশন পাঠিয়ে ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন মুদ্রাবিদ্যা ও পুরাতত্ত্বের একজন প্রমুখ বক্তা। যখনই তিনি তাদের মুখোমুখি হতেন তখনই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং শিল্পকর্ম উন্মোচন করার চেষ্টা করতেন। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যই মুম্বাই পুনর্গঠন, যাদুঘর নির্মাণ-সহ অনেক কারণে দু' হাত বাড়িয়ে দান করতেন এবং অবশ্যই রোগীদের যখনই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হতো ডাক্তারবাবু তখন সাহায্য করতেন বিনা দ্বিধায়। তিনি পরাধীন ভারতবাসীর পাশে ছিলেন, সাধারণ মানুষের সাহায্যে প্রতিনিয়ত কাজ করেছেন, ভারতীয় পরিচয়কে মাথা উঁচিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

আজকের পক্ষপাতী ইতিহাসের পাতায় কেন তাঁর স্থান নেই। নীলরতন সরকারের মায়ের মৃত্যু হয়েছিল যখন, তখন তিনি শিশু। ছোটোবেলায় তিনি শুনেছেন মার মৃত্যু হয়েছে অজানা রোগে। পরে ক্যানসার বলে জেনেছেন। মায়ের মৃত্যুর যন্ত্রণা তার মাঝে খুব অল্প বয়সেই ডাক্তার হওয়ার সিদ্ধান্ত এনে দেয়। খুবই সাধারণ আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় যখন একজন সদয় ইংরেজ ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে তার চিকিৎসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার সিদ্ধান্ত নেন, পরবর্তীতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি সম্পন্ন করেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে, তার খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে প্রায়শই প্রতিবেশী দেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার জন্য আমন্ত্রণ করা হতো। তিনি কখনোই শুধুমাত্র মেডিসিন প্র্যাক্টিস করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নিজেকে সামাজিক জীবনে গভীরভাবে জড়িত রেখেছিলেন এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, বোস ইনস্টিটিউট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে ছিলেন ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ক্লিনিক্যাল ও শিক্ষাগত সাধনা ছাড়াও ডাঃ সরকার প্রায়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য কিংবদন্তিদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কংগ্রেসেও দায়িত্ব পালন করেন। ডাঃ নীলরতন স্বদেশির একজন জোরালো সমর্থক ছিলেন, বেলিয়াঘাটায় জাতীয় সাবান কারখানা, জাতীয় ট্যানারি স্থাপনে আর্থিক ও কায়িক সহায়তা করেছিলেন এবং বুট ও সরঞ্জাম কারখানার পরিচালকও ছিলেন। এছাড়াও ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ মনমোহন অটল এবং ডাঃ স্বামীনাথন শাস্ত্রী প্রমুখ ছিলেন এই ভারতের সফল চিকিৎসক ও স্বাধীনতার অমৃত সন্ধানী ব্যক্তিত্ব। এমন আরও অসংখ্য মহৎ আত্মাদের যৌথ প্রকাশেই আজকের এই স্বাধীন ভারত। তাই আজ ইতিহাসের সঠিক প্রকাশ হোক স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের অমৃত কালের পুণ্যলগ্নে। সেইসব অমর জীবনের কষ্টিপাথরের ছোঁয়াতেই সফল হবে আমাদের বর্তমান ভারতের পথচলা। তাঁদের স্বপ্নের বাস্তবায়নের মধ্যেই সুনিশ্চিত ভাবে লুকিয়ে আছে নব ভারতের সাফল্য। আমরা তাই উচ্চারণ করি,

*'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,*
*তোমাদেরি স্মরি।*
*নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,*
*তোমাদের স্মরি...*
*বন্দিরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা, তোমাদের স্মরি...*
*রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক,*
*জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—*
*তোমাদের স্মরি।'*


## পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য। যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

জাতীয় পতাকার মধ্যে
অবস্থিত অশোক চক্রের
২৪ টি স্পোকের অর্থ
1 ভালোবাসা
2 সাহস
3 ধৈর্য
4 শান্তি
5 মহানুভবতা
6 উদারতা
7 বিশ্বাস
8 নম্রতা
9 পরার্থপরতা
10 আত্মসংযম
11 আত্মবলিদান
12 সত্যবাদিতা
13 আন্তরিকতা
14 ন্যায়বিচার
15 করুনা
16 কমনীয়তা
17 নিরহংকারতা
18 বিশ্বস্ততা
19 সহানুভুতি
20 ক্ষমা
21 ন্যায়পরায়নতা
22 আধ্যাত্মিকতা
23 নিত্যতা
24 আশা

# ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদানে মেদিনীপুরের বিপ্লবী ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

যুগে যুগে বহু বিদেশি শক্তি ভারত আক্রমণ করেছে, শাসন করেছে, শোষণ করেছে, লুঠ করে নিয়ে গেছে তার অমূল্য সম্পদ সব; কিন্তু ইংরেজ সেই জাতি, যারা এ সবের বাইরেও প্রথম আঘাত করার চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সনাতন ধারাকে, আঘাত হানার চেষ্টা করেছে তার চিন্তার জগতে, তার শিক্ষা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছে নিরন্তরভাবে। এই সর্বগ্রাসী শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে অসম অথচ সর্বাত্মক আন্দোলনে নেমেছিল বঙ্গের বিপ্লবীরা, আন্দোলনের মাটি মেদিনীপুরের বীর সেনানীরা। বঙ্গের চরমপন্থী আন্দোলন ধারায় ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেল, হাসিমুখে গলায় জড়িয়ে নিল ফাঁসির রজ্জু, মৃত্যুকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করার স্পর্ধা দেখালো; স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন আসে, এত শক্তি, এত সাহস, এমন দৃঢ় মনোবল এল কোথা থেকে? ইংরেজদের দেওয়া বিভিন্ন রিপোর্ট, খুঁজে ফেরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে, বিভিন্ন চিঠিপত্রে, হাতে আসা পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে হৃদয়-আকাশ প্রজ্বলিত করা সেই মহান শক্তির নাম হলো পবিত্র গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও উপনিষদ।

এছাড়াও একেবারে প্রথম সারিতে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', সখারাম গণেশ দেউস্কর রচিত 'দেশের কথা', শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, রাণা প্রতাপ প্রমুখের জীবনী, ম্যাৎসিনী-গ্যারিবল্ডির জীবনী প্রভৃতি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ থেকে শুরু করে প্রায় সকল বিপ্লবীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকুলতা ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, আকাশ ছুঁতে পারার এক আগুন যিনি প্রতিটি দেশপ্রেমীর বুকের গহীনে জ্বেলে দিয়েছিলেন— তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতবর্ষের আর এক নাম। ভারত আত্মা স্বামীজীর জীবন, চিন্তা, চেতনা কিংবা শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের উদাত্ত কণ্ঠে ভারত পুণ্যভূমিকে উপস্থাপন করার মূল প্রাণ ও ভিত্তিভূমি ছিল শ্রীমদ্ভগবদগীতা। গীতার সেই শাশ্বত বাণী 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা/নন্যানি সংযাতি নবানি দেহি।' অর্থাৎ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে দেহ যেরূপ নতুন বস্ত্র পরিগ্রহণ করে, সেরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ পরিগ্রহণ করে। গীতার এই শাশ্বত বাণীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বিপ্লবীরা হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আদর্শের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, চরম ঔদ্ধত্যে উপেক্ষা করেছিলেন জগতের সকল মায়া।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মেদিনীপুরের চরমপন্থী আন্দোলনের সুবিস্তৃত ইতিহাস খুঁজলে অসংখ্য উদাহরণ, প্রমাণ, রিপোর্ট পাওয়া যাবে, কেবল শ্রীমদ্ভগবতগীতায় প্রাণিত হয়ে সার্থক ও সফল হওয়া বহু আন্দোলনের রূপকথা এবং আত্মবলিদানে দীপ্ততার কাহিনি। গীতার শাশ্বত বাণীতে আত্মবলিদান করা বীর বিপ্লবীদের মহান ত্যাগের নেপথ্যমন্ত্র গীতাকে পবিত্রতার সঙ্গে স্মরণ করুক আগামীর ভারত। অগ্নিযুগের বিপ্লবী ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থী রাজনৈতিক নেতা ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত যথার্থ লিখেছিলেন, 'বর্ণমালা না পড়ে যেমন ভাষা মন্দিরে ঢোকা যায় না, গীতা না পড়েও তেমনি বিপ্লবী রাজ্যে সে যুগে প্রবেশ করা যেত না।' বালগঙ্গাধর তিলকই

প্রথম গীতার শিক্ষাকে রাজনৈতিক জাগরণের অস্ত্র করেন; শুধু রাজনৈতিক নয়, জনগণের আত্মাকে জাগরিত করতে, ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের যোগ সাধনে গীতার আশ্চর্য ভূমিকার কথা তার 'গীতা রহস্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি নির্যাস গীতা উল্লেখ করে প্রদীপ্ত করেছেন— 'সংগ্রামীদের সঙ্গে আছে ঈশ্বর; মানুষ নিমিত্ত মাত্র।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের শত শত বীর বিপ্লবীদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার এই তুমুল প্রতিযোগিতার মাটি তৈরি হয়েছিল বেশ কিছুটা আগেই। ১৮৫১ সালে তখন বঙ্গের নবজাগরণের জোয়ার শুরু হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে তখন শিক্ষা বিস্তার ঘটছে দিকে দিকে। আর এক শিক্ষাব্রতী মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের দায়িত্ব নিলেন, তিনি রাজনারায়ণ বসু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যা আজও স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ সালে আহ্বান করলেন শ্রীঅরবিন্দকে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ অরবিন্দ ঘোষ কলকাতা থেকে ভাই বারীন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখকে পাঠালেন মেদিনীপুরে। তৈরি হলো মেদিনীপুরের 'অনুশীলন সমিতি'। বিপ্লবীদের একহাতে গীতা আর অন্য হাতে তলোয়ার দিয়ে গুপ্ত সমিতির দীক্ষা দিয়েছিলেন সেদিন। অরবিন্দ ঘোষ অনুশীলন সমিতিতে গীতার নিষ্কাম কর্ম, ধ্যান ও ধারণাকে সুচারুভাবে চালিত করতে পেরেছিলেন বিপ্লবীদের অন্তরে-মননে, জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এক তুমুল ঝড়; তার নাম দেশপ্রেম, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য জীবন বলিদানের আকুতি। সেই মহান কাজে যুক্ত হলেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো।

১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং মেদিনীপুরে এলেন। আধ্যাত্মিক উর্বর ভিত্তিভূমিতে রোপিত হলো চরমপন্থী আন্দোলনের বীজ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল বঙ্গ-সহ গোটা মেদিনীপুর। ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন বসুদের নেতৃত্বে বয়কট, ঘেরাও, পথ অবরোধ প্রভৃতি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে উত্তাল হয়ে উঠল কাঁথি-তমলুক-সহ গোটা মেদিনীপুর। কলেজিয়েট স্কুলের চিত্রকর-শিক্ষক হেমচন্দ্র কানুগো প্যারিসে যান বোমা তৈরির কৌশল শিখতে। উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমাতে ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইংরেজ শাসক ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হলো মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। ব্যর্থ হলো সে উদ্যোগ। ধরপাকড় শুরু করলো ব্রিটিশ পুলিশ। মেদিনীপুরের আন্দোলনের আগুনে ঘি পড়লো, বিপ্লবের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

৩০ এপ্রিল ১৯০৮। মোজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির বোমার আঘাতে কেঁপে উঠল গোটা দেশ। ক্ষুদিরামের চেষ্টা সফল হয়নি সেদিন। অত্যাচারী কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার সেই মামলাটা শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২১ মে। রায় ঘোষণা হলো ১৯০৮ সালের ১৩ জুন। ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল সেই বছরেই, ১১ আগস্টে। নিস্তরঙ্গ ভারত জীবনে এই দুরন্ত বালকটি প্রথম শুনিয়েছিলেন মৃত্যুর সর্বব্যাপী এক গর্জন। ফাঁসির রায় ঘোষণা করল বাঁকিপুর দায়রা আদালত। ফাঁসিতে মৃত্যুর কঠিন ফরমানে ঠোঁটে স্মিত হাসি আর নির্ভীক দু'চোখে আগুন উল্লাস নিয়ে কাঠগড়ায় তখন দাঁড়িয়ে আছেন ১৮ বছর ৫ মাস ৯ দিনের মৃত্যুঞ্জয়ী এক যুবক। হতবাক বিস্মিত বিচারক জর্জ কর্নডফ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ফাঁসির আদেশের কথা শুনে তোমার ভয় করছে না? এত সাহস পেলে কোথা থেকে?' অকম্পিত নির্ভীক কণ্ঠে ক্ষুদিরাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'না আমি মরতে ভয় পাই না। আমি গীতা পড়েছি।' গীতা সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র, যা সকল ভয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার স্পর্ধা জোগায়। একইভাবে গীতার অমোঘ মন্ত্রে পরম আনন্দে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টায় আর এক সহযোগী বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীও। দিদি কুসুমকামিনীর স্বামী হেমচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন— 'গীতার অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোকগুলোতে প্রফুল্ল চাকীর আত্মবিস্মৃত হয়ে যাওয়ার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।' ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে রেল লাইনে বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডে বারীন ঘোষ ও প্রফুল্ল চাকীর সহকর্মী বিপ্লবী বিভূতিভূষণ সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে প্রফুল্ল চাকীর গীতা পাঠের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেছেন।

আর এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত। কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরামের সহযোগী হিসেবে যার পরিবর্তে প্রফুল্ল চাকীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জন্ম হুগলির চন্দননগরে, রাজনৈতিক কাজকর্ম মেদিনীপুর অনুশীলন সমিতিতে। স্বাধীনতার ইতিহাসে ক্ষুদিরাম বসুর পর প্রথম ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান করা বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত। রাজ সাক্ষী হওয়া নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যেই হত্যা করার অপরাধে ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর ফাঁসি হয়েছিল তার। একই সঙ্গে ফাঁসি হয়েছিল ক্ষুদিরাম বসুর রাজনৈতিক গুরু সত্যেন বসুরও; সেটা ২১ নভেম্বর ১৯০৮। মাত্র কিছুদিন আগে কানাইলালের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। সেই সময়ে তার স্বাস্থ্য, দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তার স্মৃতিচারণায় লিখছেন, 'মরণের আশাপথ যাওয়া দিনগুলি সে ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইতো। অনাবিল আনন্দে আলোক পথযাত্রীর মতো তার মুখশ্রী হইয়াছিল দীপ্ত ও ঢলঢল।' উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'নির্বাসিতের আত্মকথায় লিখেছেন— 'কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোনো শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউন্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ...ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেল কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল— 'তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?' মেদিনীপুরের গ্রামে-প্রান্তরে, স্কুল-কলেজে গীতা হাতে প্রতিজ্ঞা নেওয়া এরকম হাজার হাজার বীর বিপ্লবীর খোঁজ ইংরেজ কখনোই পায়নি। ১৯০৮ সালের ২ মে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ১৮ বছরের ইন্দুভূষণ রায় আলিপুর আদালতে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর জবানবন্দি দিয়েছিলেন, 'আমি দেড় মাস যাবৎ ৩২ মুরারিপুকুর রোডে বাস করে গীতা অধ্যয়ন ও বোমার খোল বানিয়েছি।'

এরই মাঝে ১৯২৯ সালে যুব সম্মেলন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সঙ্গী মৌলভি জালালউদ্দিন হামেসি। মূল লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবকদের 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স'-এ যুক্ত করা। ১৯২৩ সালে হেমচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' ১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নবরূপে সংগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই বছরই বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স'-এর মেদিনীপুর শাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুরন্ত

ঝড়ের দাপট চলছে। খেটে খাওয়া কৃষক- মজুর-শ্রমিক-সহ আমজনতা ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে দিকে দিকে। ১৯৩০ সালের ৩ জুন ঘাটালের দাসপুরের চেঁচুয়া হাটে অত্যাচারী দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও পুলিশ অফিসার অনিরুদ্ধ সামন্তকে বিক্ষুব্ধ জনতা হত্যা করে।

১৯৩১ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে দীঘা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহীদের অত্যাচারের বদলা নিতে ৭ এপ্রিল মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে অত্যাচারী জেমস পেডিকে হত্যা করেন জ্যোতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাশগুপ্ত। পেডি'র উত্তরসূরি হিসেবে এরপর মেদিনীপুরের জেলাশাসক হয়ে এলেন রবার্ট ডগলাস। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর খড়্গপুরের হিজলী জেলে রাজবন্দিদের ওপর রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নারকীয় সেই হত্যালীলার প্রতিশোধ নিতে ডগলাস খুনের দায়িত্ব পড়ল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু শেখর পালের উপর। ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল খুন হয়ে গেলেন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাস। তখন কোনো ইংরেজ আর মেদিনীপুরের জেলাশাসক হওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন না। অবশেষে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন প্রাক্তন সেনা আধিকারিক বার্নার্ড বার্জ। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দু'চোখে এঁকে নেওয়া বিপ্লবীরা তাদের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন, অত্যাচারীকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। ইংরেজদের তাড়াতে হবে এ দেশ থেকে। ১৯৩৩-এর ২ সেপ্টেম্বর, সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটা। মেদিনীপুর পুলিশ গ্রাউন্ডের মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে 'ব্রাডলি বার্ড টুর্নামেন্ট'-এর ফুটবল ম্যাচ চলছে। খেলার ছলে মাঠের মধ্যেই বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্র দত্তের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ। গ্রেপ্ততার হলেন প্রায় ৫০ জন বিপ্লবী। ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১৫ অক্টোবর। প্রথম রাজনৈতিক জীবনে ১৯২৬ সালে কলকাতা পৌরসভার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের এবং ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী হিসেবে কাজ করা এই বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়ার পর মাকে এক মর্মস্পর্শী চিঠিতে লিখছেন— 'মাগো, আমার শুধু মনে হয় যে, আপনি আমার জন্য চিন্তা করে পাছে শরীর নষ্ট করেন, তা যেন না হয়। তাহলে আমি শান্তি পাবো না। গনা, ভুজঙ্গ, খোকন, ডলি ও মেজদার খোকা— এদের দেখে আমাকে ভুলতে চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ। আমি তবে এবারের মতো আসি মা। আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। 'গীতা'টি দিয়ে গেলাম।'

মেদিনীপুরের জেলাশাসক বার্জ হত্যা মামলায় আর এক বিপ্লবী ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর। মৃত্যুর ঠিক ৪ দিন আগে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বাবাকে লেখা চিঠির কয়েকটা লাইন— 'জেল গেটে এসে বই, সকল জামা কাপড়, টাকা পয়সা নিয়ে যাবেন। 'গীতা' পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম।'

মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলাশাসক ডগলাসকে হত্যার অপরাধে তখন ফাঁসির সাজা ঘোষণা হয়ে গেছে বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের। ওই সময়কালে আইনজীবী মন্মথ দাস সাক্ষাৎ করতে যান শীতের এক সকালে। দেখেন, কম্বল মুড়ি দিয়ে গীতা পড়ছেন প্রদ্যোৎ। মন্মথবাবু জিজ্ঞেস করলেন 'গীতা পড়ছো?' প্রদ্যোতের সপ্রতিভ উত্তর 'হ্যাঁ'। —কেমন লাগছে? —'এমন আনন্দ আগে কখনো পাইনি। যেন মনে হচ্ছে ক্রমশ আনন্দ সাগরে ডুবে যাচ্ছি।' আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো মন্মথবাবুর। তাঁর কথায়, চোখেমুখে এমন অপূর্ব জ্যোতি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও লাবণ্য আগে কখনো দেখেননি। মন যেন ভয়হীন এক অনাবিল আনন্দমুখর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে। ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বউদিকে এক চিঠিতে লিখছেন— 'শ্রীকৃষ্ণের 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' বাণীতে আমি উদ্বুদ্ধ। আমার যাওয়ার কল্পনা, যা এতদিন আমি মনে মনে লালন করেছি তা সফল হতে চলেছে জেনে আমি আনন্দে আত্মহারা। এই আনন্দ ভাষা দিয়ে কোনোভাবেই প্রকাশ সম্ভব নয়।' তারপরও লিখছেন রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি থেকে— 'আকাশ হতে প্রভাত আলো / আমার পানে হাত বাড়ালো / ভাঙা কারার দ্বারে আমার / জয়ধ্বনি উঠলো রে, এই উঠলো রে।' ওই একই সময়কালে বড়দা প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্যকে তিনি লিখেছেন— 'আমি বেশ আনন্দেই আছি, মন আদৌ খারাপ হয় না। কারণ সকাল-সন্ধ্যায় কিছু কিছু গীতা পাঠ ও স্তোত্র পাঠ করিতেছি।'

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘ মেরে যিনি 'বাঘাযতীন', এক জায়গায় লিখছেন— 'গীতা কেবল পড়বার কিংবা বুঝবার বিষয় নয়, জীবনের সকল সমস্যা এবং অন্ধকারে পথ খুঁজে নিতে প্রধানতম আশ্রয় গীতা। গীতা শুধু জীবন সমস্যা থেকে মুক্তি খুঁজে দেয় না বরং শেখায় নির্ভীক হতে। সাফল্যের কথা না ভেবে কর্ম করার মহৎ অনুপ্রেরণা গীতা দেয় মানুষকে। দেয় ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের শিক্ষা।' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্য ছিল গীতা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রকৃত খবর নেওয়ার জন্য ১৯৪৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর জ্যোতিষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করলো ইংরেজ সরকার, বন্দি ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। এরপরই ফাঁসির আদেশ হয় নেতাজীর একান্ত অনুচর জ্যোতিষচন্দ্র বসুর। তাঁর আত্মজীবনী 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে'-তে তিনি লিখছেন— 'আমি স্নান সেরে বন্দিদের ডোরাকাটা পাতলুন জামা ছেড়ে নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরে মাথার চুল আঁচড়ে হাতে 'গীতা' নিয়ে একেবারে প্রস্তুত।' যদিও শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষ চন্দ্রের ফাঁসির আদেশ রদ হয় গান্ধীজীর একান্ত অনুরোধ করে বড়লাট ওয়াভেলকে লেখা চিঠিতে; একইসঙ্গে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পান নেতাজী অনুগামী আরও তিন বিপ্লবী— পবিত্র মোহন রায়, অমর সিংহ গিল এবং হরিদাস মিত্র।

শেষের জন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের পিতা। মা বেলা মিত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ভাইঝি। তাঁরই অনুরোধে গান্ধীজীর এই চিঠি। গান্ধীজীর গোটা জীবন, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জীবনবোধ এমনকী তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'হিন্দ্-স্বরাজ' মূলত গীতার ব্যাখ্যা এবং তার অনুভব কার্যকর করার উদ্যোগ। ভগবতগীতা তাঁর জীবনের অন্ধকারতম সময়ে শক্তি ও সান্ত্বনার অনাবিল উৎস হয়ে উঠেছিল। গীতাপাঠ ও তার অন্তর্নিহিত অনুভব রাসবিহারী বসুর জীবন ও চেতনাকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল। তিনি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন গীতা। ঋষি অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের ১৯০৯ সালের পর, বাকি জীবন জুড়ে সুবিস্তৃত অধ্যাত্মসাধনা এবং ঈশ্বর চেতনার মূলভিত্তি ভূমি গীতা ও উপনিষদ। একইভাবে গীতা উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বাঙ্গালি বিপ্লবী আন্দোলন চেতনার অগ্রমুখ ভগিনী নিবেদিতা। চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবনচরিত গভীরভাবে অনুভব করলে বোঝা যায় গীতার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জীবন সমর্পণ করেছেন দেশমাতৃকার বেদীমূলে। কেবল স্বাভাবিক জীবন সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে নয়, নতুন উদ্যোগ, অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা কিংবা বেঁচে থাকা সকল অস্তিত্বে গীতা পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত আশ্রয় আমাদের যাপন ও পরম্পরায়। ■

# সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন জেলায় গুরুপূজন উপলক্ষ্যে নটরাজ বন্দনা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠান

গত ২১ জুলাই সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন জেলায় গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পালিত হলো নটরাজ পূজন ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠান। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই ঋষি পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বেদ শিক্ষা করে বেদ প্রচার ও প্রসারের সুবিধার্থে বিষয় অনুসারে তিনি বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি বেদের বিভাজন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়— বেদব্যাস। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানের প্রচারের ব্যবস্থা করে তিনি মহান কীর্তি স্থাপন করেছেন। তাই হিন্দুসমাজ মহর্ষি বেদব্যাসের আচার্যত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর আবির্ভাব তিথিকে গুরুপূর্ণিমা তিথিরূপে পালন করে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই ভগবান শিব সপ্ত ঋষিকে যোগশিক্ষা দান করেন। সকল কলার আদিগুরু ভগবান শিব তথা নটরাজকে সংস্কার ভারতী গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছে। সংস্কার ভারতী এই দিনটি নটরাজ পূজন দিবস হিসেবে পালন করে। সমাজের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যদের শিক্ষা দান করে চলেছেন বা সমাজের কল্যাণে বিশেষ কোনো কাজে নিয়োজিত আছেন, তাঁকে এইদিন 'গুণীজন সম্মান' জানানো হয়।

এই গুরুপূর্ণিমায় সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের হাওড়া গ্রামীণ জেলার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও গ্রামীণ পুঁথি পত্রিকার সম্পাদক তপন কুমার সেনকে গুণীজন সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা চিত্রশিল্পী পার্থসারথি মণ্ডলকে এইদিন সম্মান জানানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তিনটি স্থানে নটরাজ পূজন অনুষ্ঠিত হয়। সোনারপুর, চড়কতলা ও বারুইপুর চর্চাকেন্দ্রের যৌথ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক অশোক ঘোষকে সম্মান জানানো হয়। গোচারণ চর্চাকেন্দ্রে সংগীত শিল্পী ছায়া কাঁসারীকে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া সোনারপুর গ্রামীণ চর্চাকেন্দ্রে নটরাজ পূজন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পক্ষ থেকে গোবরডাঙ্গায় বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী ও শিক্ষক সূর্যজ্যোতি ভট্টাচার্যকে গুণীজন সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বনগাঁ চর্চাকেন্দ্রেও গুরুপূর্ণিমার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ কলকাতা জেলার বেহালা চর্চাকেন্দ্রে তরুণ দে এবং তাঁর সহধর্মিণীকে গুণীজন সম্মান জানানো হয়। তাঁদের তৈরি স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে তাঁরা নিয়োজিত। দক্ষিণ কলকাতা চর্চাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিদুষী কৃষ্ণা সেনকে সম্মান জানানো হয়। ঢাকুরিয়া চর্চাকেন্দ্রও কসবা আদ্যা মন্দিরে নটরাজ পূজন কার্যক্রম পালন করে। উত্তর কলকাতা জেলা আয়োজিত মানিকতলা কলা স্যন্দনে উত্তর কলকাতা ও বাগুইআটি চর্চাকেন্দ্রের যৌথ অনুষ্ঠানে গুণীজন চারুকলা অনুষদ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)-এর অধ্যক্ষ ড. দেবাশিস মণ্ডলকে সম্মান জানানো হয়। দেশবন্ধুনগর চর্চাকেন্দ্রেও নটরাজ পূজন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খাপ্রেল বাজার চর্চাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে যোগ শিক্ষক অসিত দত্তকে সম্মান জানানো হয়। বীরভূম জেলা বিখ্যাত কীর্তনীয়া তুলসী দাসকে 'বিশিষ্ট শিল্পী' সম্মান জানানো হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা বংশীবাদক দশরথ কর্মকারকে শিল্পী সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। নদীয়া জেলার নবদ্বীপ চর্চাকেন্দ্র ও বারুইহুদা চর্চাকেন্দ্রে নটরাজ পূজন অনুষ্ঠিত হয়।

ফ ঃ ৪

# সিউড়ীতে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২১ জুলাই সিউড়ী শহরে বীরভূম সাহিত্য পরিষদে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কয়েকটি পর্বে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় — (১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, (২) জাতীয় আলোচনা সভা, বিষয়— আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ, (৩) গবেষণাপত্র উপস্থাপন এবং (৪) গল্প কবিতা পাঠ। অনুষ্ঠানে মূল সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিপিন মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন পর্বে ছিলেন নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য ও তপন গোস্বামী। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চক্রধর ত্রিপাঠী এবং জাপান থেকে তারাশঙ্কর অনুরাগী মাসাইয়ুকি ওনিশি।

বক্তা হিসেবে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সংগীতা সান্যাল, সিধো-কানু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবগোপাল রায় এবং ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস কর্মকার। গবেষণাপত্র উপস্থাপনে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বালুরঘাট কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও গবেষক। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন তপন গোস্বামী। মোট তিনটি হল নিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আয়োজক ও আহ্বায়ক ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

# ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের উদ্যোগে সাহিত্যসভা

গত ২৬ জুলাই ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে সল্টলেকের আজাদ ভবনে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়। সাহিত্যসভার বিষয় ছিল— সমসাময়িক সাহিত্যে রাষ্ট্রচেতনা। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন নাগপুরের বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্য সমালোচক ও ইতিহাসবিদ আশুতোষ আদোনী। সমাজ নির্মাণে সাহিত্যের উপযোগিতা ও গুরুত্ব উদাহরণ সহযোগে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ভাষা বা সাহিত্যের এক বিশেষ ভিত্তি রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ঋষি অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' শব্দটিকে পরাধীন ভারতে মাতৃমুক্তির প্রধান হাতিয়াররূপে তুলে ধরেছিলেন। এই শব্দটি কিন্তু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। যুগে যুগে সাহিত্যে রাষ্ট্রচেতনার, রাষ্ট্রনির্মাণের মূল ভিত্তি হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের অন্যতম অছি (ট্রাস্টি) সুভাষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় এই সভায় বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে সভাকে ঋদ্ধ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের কার্যকর্তা, বিশিষ্ট গুণীজন ও বাচিক শিল্পী, সাহিত্যানুরাগী ছাত্ররা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

# ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস নিবেদিত মাসিক সংস্কৃতি সন্ধ্যা 'রথযাত্রা'

গত ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের মানিকতলা-স্থিত 'কলা স্যন্দন' সভাকক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস নিবেদিত 'রথযাত্রা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. রাকেশ দাশ। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, প্রান্ত সম্পাদকদ্বয় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, প্রবীণ কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু এবং সংস্কার ভারতীর অন্যান্য সদস্য/সদস্যাবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশকে ফুল, মিষ্টি ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। 'রথযাত্রা' বিষয়ক এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ তাঁর মনোগ্রাহী বক্তব্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উদ্ধৃতি এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করে কলকাতা তথা অখণ্ড বঙ্গদেশের জনজীবনের সঙ্গে রথযাত্রার নিবিড় যোগসূত্র তুলে ধরেন। এই যোগসূত্র বর্ণনার মাধ্যমে রথযাত্রা ও জগন্নাথ বিগ্রহের দার্শনিক ভিত্তি তিনি ব্যাখ্যা করেন।

বক্তব্যের উপসংহারে ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিজাত এই অসামান্য উৎসবের বিশ্বব্যাপী মাহাত্ম্য তিনি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ভাবসংগীত ও 'রথের গান' পরিবেশন করেন অঞ্জনা মল্লিক, অমিত দে ও সুপ্রীতি ঘোষ। নৃত্য পরিবেশন করেন বৈশাখী কুণ্ডু। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সঞ্চিতা সরকার। আশা বসাকের শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্কার ভারতীর উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সম্পাদিকা দোলন চক্রবর্তী।

# রাজস্থানের যোধপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় বৈঠক

গত ২৯ জুলাই রাজস্থানের যোধপুর শহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ এবং বিদেশ থেকে ৪০০ জন কার্যকর্তা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি আলোক কুমার, মহামন্ত্রী বাগড়াজী, সংগঠন মহামন্ত্রী মিলিন্দজী-সহ সমস্ত ক্ষেত্রীয়,প্রান্ত মন্ত্রী ও সংগঠন মন্ত্রী। এছাড়াও সেবা, গোসেবা, ধর্মপ্রসার, সামাজিক সমরসতা কার্য বিভাগের ক্ষেত্রীয় প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী পুরো সময় বৈঠকে উপস্থিত থেকে সবাইকে পথনির্দেশ করেন। বৈঠকে স্থির হয়েছে, আগামী ২৪ থেকে ৩১ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী পরিষদের ষষ্ঠীবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি প্রখণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। সমরস সমাজ নির্মাণের জন্য প্রতিটি প্রান্তে কমপক্ষে একটি বিভাগে 'সমরস যাত্রা'র আয়োজন করতে হবে।

৩০ জুলাই কেন্দ্রীয় সমরসতা প্রমুখ দেবজী ভাইয়ের নেতৃত্বে সমরসতার কেন্দ্রীয় টোলি যোধপুর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে পোখরান ও জয়সলমেরের মাঝে রামদেবরা নামক স্থানে সামাজিক সমরসতার লোকদেবতা শ্রীরামদেবজীর সমাধি মন্দির দর্শন করতে যায়। শ্রীরামদেজীর বংশধর তথা বর্তমান মন্দির ট্রাস্টের প্রমুখ শ্রীভোম সিংহ তন্বর এবং শ্রীআনন্দ সিংহ তন্বর সবার সঙ্গে ভাববিনিময় করেন এবং প্রসাদ গ্রহণে আপ্যায়ন করেন।

# 'নমামি গঙ্গে'-র আয়োজনে স্বদেশী বার্তা ও দেশের মাটি

গত ২৭ জুলাই 'স্বদেশী বার্তা' সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে খড়দহের সুখচরে কাঠিয়াবাবার আশ্রমে আয়োজিত হলো 'নমামি গঙ্গে', গঙ্গাপ্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক সহযোগিতায় ছিল 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ ও অধিকারী শ্রীশ্রী মধুমঙ্গল দাস কাঠিয়াবাবা, রিষড়া 'প্রেম মন্দির' আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, স্বদেশী বার্তা সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের কার্যকর্তা মিলন খামারিয়া।

গঙ্গাস্তোত্র পাঠের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্তোত্রপাঠ করেন সুপ্রতিম চক্রবর্তী। পাশাপাশি মা গঙ্গার মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে অনুষ্ঠানের সৌকর্য বৃদ্ধি করেন বিশিষ্ট শিল্পী শীর্ষ আচার্য। এরপর উত্তরীয়, মুসুম্বি লেবুর চারাগাছ ও ফুলের মালা দিয়ে শ্রীমৎ বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী ও শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজকে বরণ করে নেওয়া হয়। তাঁদের বরণ করেন কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। বরণ করা হয় বিশিষ্ট শিল্পী শীর্ষ আচার্য, সাংবাদিক প্রদীপ দাস এবং আরও বেশ কয়েকজন গুণীজনকে।

গঙ্গা মাহাত্ম্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ। তিনি ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন কাহিনি শোনান। অনেক সাধনার পুণ্যফলে মা গঙ্গাকে আমরা মর্ত্যে পেয়েছি। দেবী-স্বরূপা সেই নদী আজ আমাদের কারণে দূষিত হচ্ছে, এ বড়ো বেদনার কথা। গঙ্গা মায়ের পবিত্রতা রক্ষা আমাদের সবার কর্তব্য বলেও তিনি জানান।

শ্রীমৎ বৃন্দাবন বিহারী দাস বলেন, 'গঙ্গা নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করলেই হবে না। তার জল যাতে বিশুদ্ধ থাকে তার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। স্বদেশী বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে যে আয়োজন এদিন করা হয়েছে তা আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ুক। মানুষ সচেতন হোক। গঙ্গা আরাধনার মাধ্যমে সেই সচেতনতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস'।

অনুষ্ঠানে গঙ্গাবন্দনা বিষয়ে একটি 'গীতি-কাব্য-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়। তাতে অংশগ্রহণ করেন প্রমিতি রায়, স্নেহাংশু দত্ত, সুপ্রতিম চক্রবর্তী, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, মিলন খামারিয়া ও দেবকুমার কর্মকার। সংগীত, ভাষ্যপাঠ ও কাব্যে জমে ওঠে এই পর্ব। আলেখ্যটি রচনা ও সংকলন করেছেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

জাতীয়তাবাদী শিল্পী শীর্ষ আচার্য তাঁর নির্মিত মা গঙ্গার অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যটি তুলে দেন মহারাজদের হাতে। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বিভিন্ন উপাচার-সহ মা গঙ্গার আরাধনা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩০টি মুসুম্বি লেবুর চারাগাছ দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষ থেকে বিশিষ্টজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিলন খামারিয়া। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সোমক বন্দ্যোপাধ্যায়।

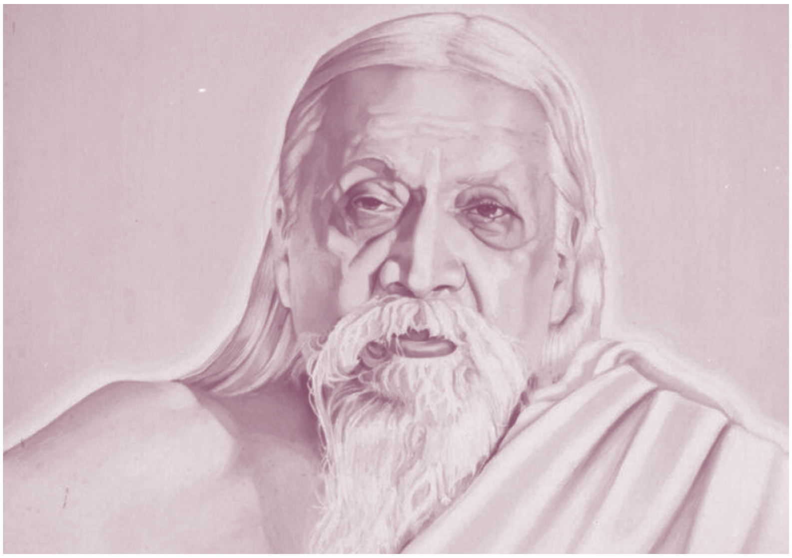

# শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম হলো 'নতুন সার্বভৌমিকতা'র ভাবনা

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অতি সাধারণ সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞার সঙ্গে চৈতন্য মেশালে যা হয় তাই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের নতুন সার্বভৌমিকতা ও মানবিকতার ধর্ম। কিন্তু এই মিশ্রণের পদ্ধতির আড়ালে যে চৈতন্যের প্রকাশ তা ধরতে গেলে বুঝতে হবে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগের অর্থ বা ব্যবহার। তা বৈজ্ঞানিক ও নিরলস প্রয়াস। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছিলেন প্রতিটি মানুষ যোগী, শুধু সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। আর তাই সম্পূর্ণজীবনই হলো যোগ— অল লাইফ ইজ যোগা। দৈনিক জীবনে তা অনায়াসেই সম্ভব। তবে তা কোনোভাবেই 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র মতো কোনো সাধারণ উপনিষদের ভাবনা নয়, যার বহু ব্যবহারে সমাজতন্ত্রের টুপির মতো আকৃতি হারিয়ে গিয়েছে। তার থেকে সৃষ্টি হয় মানব ধর্ম; মানবিকতার ধর্ম নয়। দুয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোনো ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠী ধর্ম নয়। 'দ্য রিলিজিয়ন অব হিউম্যানিটি' বা মানবিকতার ধর্ম। শ্রীঅরবিন্দের কাছে সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

তবে তা নিছক সমাজ সংস্কার বা মানুষের বস্তুগত উপকারের বার্তা নয়। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবতে পারেন এ আবার কী ধরনের ধর্ম যেখানে পূজাপাঠ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, লড়াই-ঝগড়া বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনো দাবি নেই। অথচ এই ধর্ম দাবি করছে তার মধ্যে সব আছে। কেবল গোঁড়ামিটুকু নেই। শ্রীঅরবিন্দের মতে সনাতন ধর্ম সেটাই যা অন্য সমস্ত কিছুর ওপর প্রভাব ফেলে। কট্টরবাদী চিন্তার রাস্তা ধরে কারও ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয় না। এ বিষয় বহু বিশ্লেষক আর ঐতিহাসিকের সঙ্গে আমি একমত। তাদের মতে শ্রীঅরবিন্দের সনাতন ধর্মের ভাবনা অভিনব ও নতুন। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে তিনি যা ভেবেছিলেন আজ তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠছে। তাই তার অন্য নাম 'নতুন সার্বভৌমিকতা' বা 'অন্য সার্বভৌমিকতা'। এর মূলে রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বভাবনা যেখানে বেশিরভাগ ধর্ম সংকীর্ণ গলির পথ। মানুষকে তা যতটা পথ দেখায় তার থেকে বেশি পথ ভোলায়। তাই ধর্মের ডিকনস্ট্রাকশন বা তাকে বিশ্লেষণের অভ্যাস প্রয়োজন।

ধর্ম যেমন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তেমনই আবার ভুল ধারণা তৈরি করে বিচ্ছিন্ন করে। তাঁর কাছে ধর্ম যেমন মেধা চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে তেমনি আবার প্রয়োগে তা সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে। অনেক সময় প্রথাগত ধর্ম কল্পনা হলেও মানবিকতার ধর্ম শাশ্বত ও সুন্দর। মেধার সঙ্গে মানবিকতার অভ্যাসের মিলনে তার সৃষ্টি। ভারতের ঋষিকুলের তেমনই অবদান। তাই ধর্ম কারও কোনো ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিষয় নয়। এমনকী গোষ্ঠীগত নয়। মানুষের ধর্ম বলেও কিছু হয় না। তাঁর কাছে ধর্ম একটাই। মানবিকতার ধর্ম। সেটাই সনাতন। সেটাই শাশ্বত। তার কোনো লয়, ক্ষয় নেই। তা অমর, অব্যয় ও অক্ষয়। আজ থেকে একশো বছরের আগে সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শনে এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ পণ্ডিচেরি থেকে প্রকাশিত আর্য পত্রিকায় একটানা 'দ্য আইডিয়াল অব হিউম্যানিটির' ৩৫টি অধ্যায় লিখে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছিলেন কীভাবে মানুষের ধর্ম নয়, মানবিকতা ও মানবতার ধর্মের গোড়াপত্তন হতে পারে। আলোড়ন ফেলা এই রাজনৈতিক শাস্ত্র বা গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের ধর্ম কথাটির নতুন ব্যাখ্যা করে বলেন কীভাবে মানুষের ধর্মকে মানবের বা মানবিকতার ধর্ম করে গড়ে তোলা যায়। চিন্তাভাবনায় ভীষণ রকমের আধুনিক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

তাই প্রথাগত ধর্মের চিরাচরিত ও বস্তাপচা ব্যাখ্যা না করে আইডিয়াল হিউম্যানিটিতে দেখিয়েছিলেন কীভাবে মানবিকতার ধর্ম পৃথিবীতেই মানুষকে দিব্য জীবনের সন্ধান দিতে পারে। ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্রের নয়। তার চৈতন্যের পরিবর্তন আনতে পারে। তাঁর কাছে এই মানবিকতার ধর্ম কোনো মান্ধাতা আমলের ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয়। তা ধর্মের উত্তর-আধুনিক যুগের ব্যাখ্যা। কেউ তা মানতে পারেন, কেউ তা

ফেলে দিতে পারেন কিন্তু সমস্ত ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও মানবিকতার ধর্ম থেকে যাবে যা কিনা আবার নতুন করে মানুষের নতুনভাবে বেঁচে থাকার রসদ জোগাবে। মানবিকতার ধর্মের সৃষ্টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন তার পূর্বসূরি হলো বাস্তববাদী দার্শনিকদের 'মানস পুত্র' যাত্রার মতো। যার অর্থ সমস্ত ভাবনা অভিজ্ঞতালব্ধ। এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্র, সমাজবাদ বা দৃষ্টবাদ।

মানুষকে দেবতা বা ঈশ্বরের অংশ ধরে নিয়ে এগোলে আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের মানবিকতার ধর্ম সার্থক হবে না। তাতে জটিলতা বাড়বে। প্রতিটি ধর্মের আলাদা দেবতা রয়েছে সেই সঙ্গে রয়েছে ইষ্টদেবতা। ফলে লড়াই ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী। সবার উপরে মানুষ সত্য এটা ধরে নিলেও দেশ, সমাজ, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান কেউ মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলতে নারাজ। শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই মানবিকতার ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করেও বলেছেন তা যেন কোনোভাবেই মানব নৈতিকতার পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। বিজ্ঞানকে তিনি একমাত্র জীবন্ত সত্তা বলে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন সেই তাকে কীভাবে মানবিকতার ধর্ম তুলে ধরতে ব্যবহার করা হবে তা কেবল মানুষের সদিচ্ছার প্রকাশ।

মানবিকতার ধর্মের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতী আক্রমণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যা সে তুলে ধরতে চায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। তার প্রয়োজনে সে হত্যালীলাও চালাতে পারে। বিশ্ব ইতিহাসে সেটাই হয়ে এসেছে ও মানুষ বারবার তার ব্যাখ্যা করে গিয়েছে। আলোচনা করেছে। কিন্তু কখনো তা নিয়ে ভাবেনি। শ্রীঅরবিন্দের মতে আমাদের দেশের খেটে খাওয়া শ্রমিক বা কৃষকদের নিয়ে বহু রাজনৈতিক দল ব্যাখ্যা বা আলোচনা করেছে কিন্তু কখনো তাদের নিয়ে ভাবেনি। আলোচনা করা বা কারও কথা বলা এবং তাকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টা ভাবনায় লেগে থাকার বিস্তর ফারাক। ফলে এদেশের শ্রমিকদরদি রাজনৈতিক দলেরা ক্ষমতা পেয়েও তাদের চিরন্তন ভাবনা এবং তার উন্নতিতে তাদের কোনো স্থান দেয়নি। সংস্কারবাদী মন নিয়ে তাদের ভালো করেছে রাজনৈতিকভাবে তাদের ব্যবহারের জন্য। নেতাদের ও দলের জন্য। শ্রীঅরবিন্দের মানবিকতার ধর্মের ব্যাখ্যা অত্যন্ত বেশি রকমের উত্তর আধুনিক যা কিনা উত্তর ঔপনিবেশিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একালের সমাজবিজ্ঞানের সবচাইতে চর্চিত বিষয় অনেকটা 'পোস্ট ট্রুথ'-এর আওতায় চলে এসেছে।

২০১০-এ ব্রেক্সিটের পর তা জোরদার হয়ে উঠেছে। এখানে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং আবেগ প্রধান জায়গা নিয়েছে। তার পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের একটি ঘোরতর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। শ্রীঅরবিন্দ চাননি তাঁর নামে কোনো আশ্রম গড়ে উঠুক। মাদার মিরাকে বলেছিলেন আশ্রম হলে পুরোটাই একজনের বিষয় (ওয়ান ম্যান অ্যাফেয়ার) হয়ে উঠবে। মন থেকে মেনে না নিলেও মাদারের অনুরোধে একটি আশ্রম সংবিধান তৈরি করে দেন। শ্রীঅরবিন্দের মানবিকতার ধর্ম মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন আনতে পারে কিনা তা নিয়ে বহুবার বিতর্ক হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি কেবল মানুষকে মুক্তি বা আনন্দের পথ দেখাতে পারে এই ধরনের উদ্ভট তথ্য তিনি কোনোদিন মেনে নেননি। অজানা হলেও প্রতিটি মানুষের একটি অন্তর্সত্তা রয়েছে। আর সেটাই আসল মানুষ। মানবিকতার ধর্ম তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তার প্রকাশ কোনো ঈশ্বর, অবতার বা মহামানবের অবদান নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে তা অভিজ্ঞতালব্ধ।

অষ্টাদশ শতকে পশ্চিমে মানবিকতার ধর্মের ধারণা তৈরি হয়েছিল অন্তর্দৃষ্টির হাত ধরে। যা কোনো ভাবেই বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ অন্তর্দৃষ্টির পুনরাবৃত্তি হয় না। আর সেখানেই তার দুর্বলতা। শ্রীঅরবিন্দের মানবিকতার ধর্ম তেমন কোনো অন্তর্দৃষ্টি নির্ভর নয়। ফরাসি বিপ্লবের পর স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে দাবি বিশ্বজুড়ে উঠেছিল তার মধ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দ কেবল ভ্রাতৃত্বকেই বেছে নেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন অন্য দুটি ধারণা অনেকটাই পরস্পর বিরোধী এবং একধরনের মূর্খ অহংবোধের শিকার। অথচ পৃথিবীজুড়ে ভ্রাতৃত্বকেই সরিয়ে রাখা হয়েছে সাম্য ও স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে কেবল সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সাম্য ও স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে ভোঁতা অস্ত্র হিসেবে। তাতে মানুষের প্রবৃত্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর মূলে রয়েছে মানুষের অহং বুদ্ধি যা আসল মানুষকে ঢেকে দিয়েছে। তাকে নকল চিন্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা অত্যন্ত বেদনার যে আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক সম্পর্ক তৈরির জন্য কোনো পাঠ্যক্রম নেই।

তাই শ্রীঅরবিন্দ সঠিকভাবে আফশোস করে লিখেছিলেন ভ্রাতৃত্বকে কোনো শাসক বা তার অনুসারী কোনোদিন সমাধানের রাস্তা হিসেবে বেছে নেয়নি। অনেকটা তার সুবিধার্থে সে তা করেছে এবং সাম্য ও স্বাধীনতার মিথ্যা ধ্বজা উড়িয়েছে তা লিগ অব নেশনস হোক বা আজকের আধুনিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ। মানবিকতার ধর্মকে বাদ দিলে এর সবটাই মিথ্যার বেসাতি। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'যে সমাজ স্বাধীনতার আদর্শ ধরে এগোতে চায় সে সমাজ সাম্য খুঁজে পায় না। যে সাম্য ধরে এগোতে চায় তাকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। আর ভ্রাতৃত্বের দাবি নিয়ে যে সমাজ এগোতে পারে সে তো তার মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিপরীতে চলে গিয়েছে এক বৃহত্তর মানবিকতার লক্ষ্যে।' তাই ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান এ যুগে বেমানান। কারণ অহং স্বাধীনতা চাইলে সে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সাম্য চাইলে এক যন্ত্রচালিত মানবিকতারহিত সমাজ ও পৃথিবী গঠন করে। বিশ্বজুড়ে সেটাই দুর্নীতি ও অত্যাচারের রাস্তা। শ্রীঅরবিন্দ তা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন মানবিকতার খাতিরে, নতুন সার্বভৌমিকতার লক্ষ্যে। ❑

# স্বদেশপ্রেমী-বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

কলকাতা সায়েন্স কলেজের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি কক্ষ। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি খাটিয়া, দুটি চেয়ার, ছোটো একটি খাওয়ার টেবিল, একটি পড়ার টেবিল ও জামাকাপড় রাখার একটি সস্তা আলনা। পরনে থাকত কম দামের মোটা খাটো ধুতি, চাদর, গেঞ্জি অথবা গায়ে একটি কোট। এক রাশ দাড়িগোঁফ মুখে। চুলে চিরুনি পড়েনি। সকালে এক পয়সার বেশি জলখাবার হলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। অন্যান্য খাবারদাবারও খুব সাদামাটা। অথচ তখন মাসিক আয় হাজার টাকার উপরে। মোট আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকি সব দান করে দিতেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম লেখা ছিল ‘বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী’। ১৯১৯ সালে ১৮ জানুয়ারি রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সেখানে যোগ দিয়ে বলেন--- ‘আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষণাগারেই আমার কাজ, কিন্তু এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। আমি অনিষ্টকর এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।’

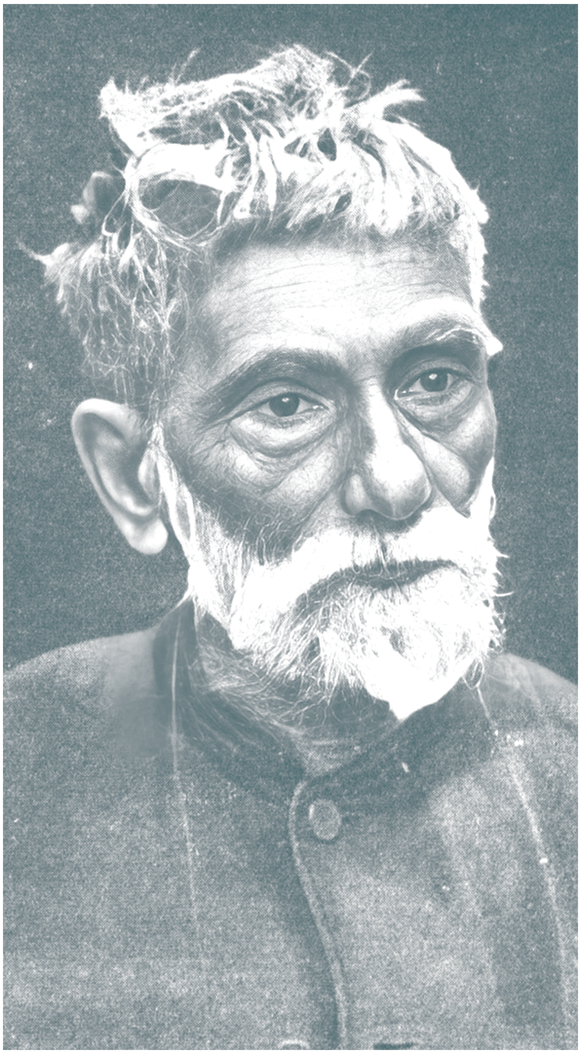

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে— ‘আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রাম সেবকদের সঙ্গে গ্রাম সেবক আর অর্থনীতিবিদদের মহলে অর্থনীতিজ্ঞ।’ রসায়নশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ‘আচার্য’ রূপে বিশ্বজুড়ে পরিচিত হন।

তাঁর পিতার নাম হরিশ চন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। ছোটোবেলায় মায়ের কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি, এরপর পাঠশালা এবং পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই স্কুলে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। ১৮৭২ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭৪ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় গুরুতর রক্তআমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ায় ২ বছর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। এই সময় পিতা হরিশ চন্দ্র রায়ের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পান। ১৮৭৬ সালে কেশব চন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৭৮ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৃত্তি না পাওয়ায় তাঁর শিক্ষকরা নিরাশ হলেও তিনি মনে করতেন— ‘পরীক্ষার নম্বরই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়, যারা পরীক্ষায় ভালো করেছে তারা অনেকেই পরবর্তী জীবনে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে। জীবনের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য স্থির লক্ষ্য ও সুষ্ঠুভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিক্ষালাভ অনেক বেশি ফলপ্রদ।’ ১৮৮০ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএ-তে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে লন্ডন চলে যান এবং বিএসসি-তে ভর্তি হন। ১৮৮৫ সালে সেখানে পড়ার সময় ‘সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে’-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে ‘Essay on India’ নামে প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

এডিনবার্গ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএসসি পাশ করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল--- ‘অন পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস্’। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১০০ পাউন্ড অর্থমূল্যের ‘হোপ প্রাইজ’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পরও তিনি আরও এক বছর ‘অন অ্যানালিসিস অফ ডাবল সালফেটস্ অ্যান্ড দেয়ার ক্রিস্টাল বিহেভিয়ার’ বিষয়ে গবেষণা করেন। পড়াশোনা শেষ করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দেশে ফিরে আসেন এবং প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে ‘পালিত অধ্যাপক’ এবং ১৯৩৭ সাল থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমৃত্যু এমিরিটাস প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর সময় উদ্দীপক উপাখ্যান বর্ণনার মতো করে সাহিত্যের সহজ ভাষায় রসায়নের বিষয়গুলি তিনি ছাত্রদের নিকট তুলে

ধরতেন। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ২৭ বছর অধ্যাপনা জীবনে আমি সচেতনভাবে প্রধানত নীচের ক্লাসেই পড়াতাম। কুমোর যেমন কাদার ডেলাকে তার পছন্দমতো আকার দিতে পারে, হাইস্কুল থেকে সদ্য কলেজে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তেমনই সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। আমি কখনও কোনো নির্বাচিত পাঠ্যবই অনুসরণ করে পাঠ দিতাম না।’ শিক্ষক হিসেবে তিনি বলতেন, ‘সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।’

একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে কতটুকু ভালোবাসেন বা দিকনির্দেশনা দেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মকাণ্ডে। ফজলুল হক (শের-এ-বাংলা) ৫/৬ দিন ক্লাসে না এলে একদিন বিকালে প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার বাড়িতে যান। ফজলুল হক তখনও খেলার মাঠে থাকায় তিনি তার জন্য অপেক্ষা করেন। ফজলুল হক ফিরে এসে স্যারকে দেখে তিনি কতক্ষণ এসেছেন জানতে চাইলে বলেন— ‘তোমাদের হিসেবে এক ঘণ্টা আর আমার হিসেবে ষাট মিনিট’।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একই প্রতিষ্ঠানের, একই সময়কার শিক্ষক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্ররাই পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁকে ‘বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী’ বলা হতো। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ড. মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্র কুমার সেন, বিমানবিহারী দে, ড. কুদরত-ই-খুদা, প্রিয়দা রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র লাল দে, প্রফুল্ল কুমার বসু, বীরেশ চন্দ্র গুহ, অসীমা চট্টোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১২ সালে লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠায়। এই সময় ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় পি.সি. রায়কে সম্মানসূচক ‘ডক্টরেট’ উপাধি প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কলকাতা, ঢাকা, মহীশূর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের জন্য স্যার উইলিয়াম রামসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. এইচ. ভেলি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘তিনি (অধ্যাপক রায়) সেই আর্যজাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি--- যে জাতি সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করত। এমন এক যুগে তারা বহু রাসায়নিক সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিল, যখন এদেশ (ইংল্যান্ড) অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধ্যাপক রায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে সত্য প্রমাণ করিয়াছেন তাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী। একই বছর স্যার পি.সি. রায় ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ‘Companion of the Indian Empire (C.I.E.)’ উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯১৯ সালে ‘নাইট’ উপাধি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁরে সম্মানিত করে। ১৯৩২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তরতম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির ভাষণে কবিগুরু বলেন, ‘আমরা দু’জন সহযাত্রী, কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেছি।’ পরে কবিগুরু আচার্যদেবের হাতে একটি তাম্রফলক উপহার দেন। কবির স্বরচিত দুটি ছত্র তাতে উৎকীর্ণ ছিল—

‘প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজনপ্রিয়
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।’

১৮৮৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর বিজ্ঞানের গবেষণায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারের ফলে সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তার স্বীকৃতি মেলে। এরপরে ১২টি যৌগিক লবণ, ৫টি থায়ো-এস্টার আবিষ্কার এবং ১৪৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ডাচ অ্যাকাডেমি, লন্ডনের রসায়ন সমিতি তাঁকে ‘অনারারি ফেলো’ নির্বাচিত করেন। দুই খণ্ডে রচিত ‘এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’ বইতে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১২০০ শতাব্দী এবং তারও আগের ভারতবর্ষের রসায়ন চর্চার ইতিহাস তুলে ধরে প্রমাণ করেন যখন ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ গাছের ছাল বা বাকল পড়ে লজ্জা নিবারণ করত, তখন ভারতবর্ষের মানুষ পারদের ব্যবহার এবং পাতন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড’ নামে ১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল আত্মপ্রকাশ করে। নিজ জেলা খুলনার মানুষের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে সমবায় ভিত্তিক ‘প্রফুল্লচন্দ্র কটন টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালের জুনে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসেমি এবং ডুমুরিয়ার মৌলানা আহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারে গান্ধীজী খুলনায় এলে তিনি স্টিমার ঘাটে তাঁদের স্বাগত জানান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি। ১৯২৩ সালে কাকিনাড়া কংগ্রেসের কনফারেন্সে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলির অনুপস্থিতিতে কিছু সময় তিনি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। একই সময় পাইকগাছা উপজেলার কাটিপাড়ায় ‘ভারত সেবাশ্রম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজ জন্মভূমির এলাকার মানুষকে চরকায় সুতো কাটার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় একটা চরকা স্থাপন করে নিজেও সুতা কাটতেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের খুলনা জেলার স্থান হিসেবে আচার্য রায় নিজের গ্রাম রাড়ুলিকে নির্বাচন করেন। ১৯০৩ সালে পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুলকে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন এবং তিনি ও তাঁর ভাই নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী--- রাড়ুলী, বাকা, কাটিপাড়া, খেসরা প্রভৃতি গ্রামের শিক্ষাপ্রেমী ব্যক্তিদের এক সভা থেকে আর.কে.বি.কে. হরিশচন্দ্র ইনস্টিটিউট নামকরণ করেন। ১৯১৮ সালে বাগেরহাটে তাঁর অর্থানুকূল্যে বাগেরহাট কলেজ স্থাপিত হয় যা পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরই ছাত্র শের-এ-বাংলা ফজলুল হকের প্রস্তাবে ‘প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজ’ নামে পরিচিতি পায়। এছাড়া সাতক্ষীরা চম্পাপুল স্কুলও আচার্য রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালি জাতিচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। দেশের সমবায় আন্দোলনকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ১৯১৭ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি, ১৯১৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ স্টোর অ্যান্ড ক্যান্টিন, ১৯২১ সালে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি-সহ অনেক সমবায় সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন যে ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’। এই কারণে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ব্যবসার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৯২৩ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় তিনি ধর্মগোলা ও সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

*(সংগ্রাহক : দেবাংশু পতি
তথ্য ঋণ : প্রতাপ সাহা)*

# ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিভঙ্গী

**দীপক খাঁ**

ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে তিনি জাতীয় জাগরণের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত নবভারতের 'আনন্দমঠ' রামকৃষ্ণ মিশনের 'সঙ্ঘজননী'। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে দেখা গেছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, যুগন্ধর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গে নবজাগরণ, নারী সমাজের বন্ধনমুক্তি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ এবং সর্বোপরি বঙ্গের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল ইতিহাসখ্যাত স্বদেশি আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ। তৎকালীন জাতীয় মানসিকতা ও নেতৃবৃন্দের চেতনায় একটি মানুষ গভীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন— তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অগ্রদূত, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের চির নমস্য, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধাননায়ক— স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীশ্রী সারদামায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে 'খাপখোলা তোলোয়ার' স্বামীজী মার্কিন মুলুকে যাত্রা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয়তাবোধের সূচনা হয়েছিল— ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর সুদূর চিকাগো শহরের বুকে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সেই বিজয়ী বীর— (মায়ের ভ্রাতৃবধূর কথায়) রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে, লম্বা হয়ে পড়ল, জোড়হাতে বলল— 'মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়'। শ্রীশ্রী সারদাদেবীর কাছে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সমগ্র নবভারতের আত্মসমর্পণ।

ভগ্নী নিবেদিতার কথার সূত্র ধরে বলা যায়, 'তিনি ভারতীয় নারীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন ভারতের অগ্রদূত।' দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল শ্রীশ্রী মায়ের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জয়রামবাটীর মাটি তাঁর কাছে চির পবিত্র। জয়রামবাটীর পবিত্র ভূমিকে প্রণাম করে তাই তিনি বলেন : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' দেশবাসীর দুঃখ, দারিদ্র, দুর্দশা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষে তিনি মর্মাহত হন— কখনও বা হৃদয়বিদারক, মর্মভেদি ক্রন্দনে ফেটে পড়ে হতশ্রী দেশবাসীর দুঃখ নিবারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানান। তাঁর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অতিরিক্ত যত্ন নিতে আগ্রহী এক সেবক-সন্তানকে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন— 'এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হলো আমার বৈঠকখানা। আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব-ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। এখানে যদি তোমাদের কথামতো পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না। শরৎকে লিখে দাও।'

জনৈক আশ্রম-অধ্যক্ষ একবার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশ্রমকর্মীদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ করলে মা বলেন— 'ছেলেরা সাধু হয়েছে, ভগবানকে ডাকবে, নিজের জীবন সার্থক করবে। আশ্রমের কাজকর্ম তো যথাসাধ্য করছেই, করবে। তাদের বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে, নিজের ভালো-মন্দ, সুখ-সুবিধা বুঝে তারা স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে তাতে তুমি বাধা দিয়ে কিছু বলতে পারবে না। ভালোবাসায় সব কিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।'

ইংরেজ শাসনকে কখনোই মা সুনজরে দেখেননি। তাঁর মতে ভারতের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটনের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন। একবার প্রবোধবাবু ইংরেজদের প্রশংসা করে বলেন— ইংরেজ সরকার আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক কিছু এবং দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে'। 'মা' বলেন— কিন্তু বাবা, ওইসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড়ো বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪-১৯১৮) বস্ত্রের জন্য হাট লুঠ হচ্ছিল। দরিদ্র কুলবধূরা লজ্জানিবারণে অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করছিলেন। মফস্সলে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জন দিয়ে রমণীরা বস্ত্র সংগ্রহ করছে। বয়স্কা কন্যারা ও বালিকারা বস্ত্রাভাবে লোকের সম্মুখে বের হতে পারে না। বস্ত্রাভাবে নারীদের আত্মহত্যা ও অপরাপর কাহিনি শুনে শ্রীমা অবোধ বালিকার মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করেন এবং ক্রমাগত বলেন : পরনের কাপড় না পেলে মেয়েরা কী করবে! লজ্জা-শরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় কী!' সেদিন সমবেত ভক্তের সামনে অধীরভাবে মা বারবার বলতে থাকেন : 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো।' শান্ত হয়ে মা সখেদে বলতে লাগলেন— 'তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কার্পাস চাষ হতো, সকলেই সুতা কাটত, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের

ফঃ ৫

অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিল। কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিল— টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ। সব বাবু হয়ে গেল— চরকা উঠে গেল। এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।'

স্বদেশি আন্দোলনেরকালে বিদেশি দ্রব্য বর্জন, দেশি দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি নানা কাজে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। স্বামী পরমেশ্বরানন্দের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, মা একদিন তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলেন : 'বাবা তোমরা এরকম করে বেরিয়ো না— তাঁত করো, চরকা করো, আগে তো তাঁতের কাপড়ই সবাই পরত, চরকা পেলে আমিও সুতো কাটি।' মা ওইকথা বলিয়া আমাদের খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁতে একখানি কাপড় বুনিয়া শ্রীশ্রীমাকে পরিধান করিতে দিলাম, বয়ন ভালো না হইলেও তিনি পরিয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।' বলাবাহুল্য, বস্ত্রসমস্যা নিবারণের জন্য বঙ্গের নারীসমাজ সত্যই সেদিন চরকায় সুতো কাটা শুরু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনও সেদিন বস্ত্র বিতরণের কাজে নেমেছিল।

শ্রীশ্রীমা কেবলমাত্র স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের অবসান কামনাই করতেন না, সরকারি অনাচারের 'প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ করিতে দেশবাসীর উদ্যম প্রয়োজন ও প্রশংসনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করিতেন।' মায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটকের স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন : 'আগে ওদের ধ্বংস হবে— নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'

জাতীয় আন্দোলনে নানা অনাচার দেখে বিশ্বকবি সেদিন প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়ে গঠনমূলক কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীমায়ের কণ্ঠেও সেই সাবধান বাণী— স্বদেশির নামে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি নয় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে প্রকারান্তরে হল্লাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়— স্বদেশির লক্ষ্য গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হয়ে দেশের কল্যাণ সাধন করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কার্জন থিয়েটারে এক দীর্ঘ ভাষণে সেই 'কাজ' করার কথাই বলেছেন : 'স্বদেশি আন্দোলন যেন শুধু কথায় আবদ্ধ না থাকে, আমাদিগকে আপনার শিল্পের উন্নতি করিতেই হইবে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের শিল্প উপেক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের চক্ষু খুলিয়াছে— আমরা বুঝিয়াছি, শিল্পে উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদের পতন অনিবার্য।'

কেদারবাবু প্রসঙ্গক্রমে বলেন : 'মা, স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে কত কাজই না হতো!' একথা শুনে মা তাড়াতাড়ি বলেন— 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কী আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন 'খাপখোলা তোলোয়ার।'

এই কথোপকথনে বোঝা যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন হলেও গঠনমূলক কর্মের মূলে সর্বাগ্রে রাখতে হবে আধ্যাত্মিকতা। ভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কাছে আধ্যাত্মিকতাই ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূল ভিত্তি এবং জাতীয়-মুক্তিসংগ্রাম ছিল স্পষ্টতই একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, গীতা, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ছিল চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণার উৎস। বিপিন চন্দ্র পালের মতে : 'The new nationalist movement in India is essentially a spiritual movement।' শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'জাতীয়তা হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি ধর্ম। মনে রেখো, তোমরা হলে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র।' মায়ের কয়েকজন সন্তান সংকল্প করেছিলেন যে, তাঁরা অবিবাহিত থেকে আজীবন সমাজসংস্কার ও দেশসেবা করবেন। এ ব্যাপারে মায়ের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে মা তাদের বলেছিলেন : 'শুধু সমাজসেবা ও দেশসেবা নিয়ে সারাজীবন দেহ-মন শুদ্ধ রাখা কঠিন। গুরুকে ভালোবেসে, ইষ্টকে ভজনা করে কুমার থাকা সহজ। মেয়ে-পুরুষ যেই অবিবাহিত থাকবে, ঈশ্বরকে ধরে পথ চলতে হবে, তাঁকে ভুলে গেলে নানান গোলযোগ আসে। আর একটি কথা সর্বক্ষণ মনে রাখবে— মেয়েমানুষ থেকে ফারাক, সোনার মেয়েমানুষ হলেও সেদিকে ফিরে চাইবে না। তবে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হবে।'

এখানেও সেই আধ্যাত্মিকতার সুর স্পষ্ট। বিপ্লব, আন্দোলনের আদিপর্বে গুপ্তসমিতিতে নিকটাত্মীয় ভিন্ন কোনো মহিলার প্রবেশাধিকার ছিল না এবং সেখানেও ব্রহ্মচর্যের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হতো।

একবার কয়েকজন বিপ্লবী সন্তান মাকে ইংরেজের অনাচার-অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন— মা, তুমি একবারটি মুখ দিয়ে বলো— 'ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক'। সন্তানদের মর্মজ্বালা অন্তরে অনুভব করেও মা বলেছিলেন— 'আমি মা হয়ে মানুষকে উচ্ছন্নে যেতে কী করে বলবো, ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক।' বলাবাহুল্য, ভারতীয় জাতীয়তা কখনোই স্বদেশপ্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং দেশপ্রেমকে আন্তর্জাতিকতাবোধে রূপান্তরিত করাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, স্বামীজীর রচনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ পুলিশের একটা ভীতি ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে শ্রীশ্রীমা ছিলেন বহু দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের তাপদগ্ধ, নির্যাতিত ও অন্তরীণ জীবনে শান্ত স্নিগ্ধ মরুদ্যান। সঙ্ঘজননীকে ভক্তি জানিয়ে তাঁরা যোগ দিতেন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে, হতাশাময় জীবনে শান্তিলাভের আশায় ছুটে আসতেন মায়ের কাছে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় লেখেন : 'যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন তাঁহার রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ শশিসুধা পান করিও— তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।' স্বদেশি আন্দোলনের কালে বহু তরুণ বিপ্লবীই বেলুড়মঠে যাওয়া-আসা করতেন, মঠের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং মঠ-কর্তৃপক্ষও তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), রাধিকা গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাসগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ— 'ভরত

মহারাজ') উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই অনুশীলন সমিতির উল্লেখযোগ্য কর্মী এবং পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বে কারাবাস বা অন্তরীণ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেই অর্জন করেছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-দীক্ষিত।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২ মে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হন। শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। অরবিন্দ পত্নী মৃণালিনী দেবী বলছেন— 'তখন স্পষ্ট আমার প্রতীয়মান হলো যে, তাহার সঙ্গছিন্ন আমার জীবনে মৃত্যুই একমাত্র পথ। কিন্তু তবুও আমার মৃত্যুবরণ হইল না' একসময় অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ভগ্নী সুধীরা মৃণালিনী দেবীকে বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর মানসিক শান্তির জন্য প্রার্থনা জানান। সব শুনে মা বলেন : 'চঞ্চল হইও না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ নেই, তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত পুরুষ। ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি অতি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হইয়া আসিবেন।' মানসিক শান্তির জন্য তিনি মৃণালিনীকে 'সব সময় ঠাকুরের বই অর্থাৎ 'কথামৃত' পড়তে বলেন। বলাবাহুল্য মৃণালিনীদেবী মধ্যাহ্নে 'কথামৃত' ও ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন। মৃণালিনী ভগ্নী শৈবলিনী মিত্র লিখছেন— 'মৃণালিনী দেবীকে বউমা বলবার কারণ জানা নেই, তবে যতদূর মনে হয় শ্রীঅরবিন্দকে সন্তানতুল্য মনে করতেন বলেই বা।' ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আলিপুর বোমার মামলার অবসানে যেন তার জোয়ার এল। নিবেদিতা লিখছেন--- সকল মহান জাতীয়তাবাদীই ওই কাজ (তাঁর চরণ স্পর্শের কাজ) তখন করে থাকেন।' আর স্বামী সারদানন্দ কোনো কারণেই (অর্থাৎ ব্যাপারটা রাজনৈতিক ভাবে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও) কাউকে ফিরিয়ে দেন না।' শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মৃণালিনীর দীক্ষা সম্পর্কে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ বলেন : 'I was glad to know that she had found so great a spiritual refuge...'।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জ বিরাট শোভাযাত্রা করে যখন সস্ত্রীক রাজধানীতে প্রবেশ করছেন, তখন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাস তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন। প্রাণে বেঁচে গেলেও বড়লাট সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হন। শ্রীমা তখন কাশীতে ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী দেবব্রত মহারাজ। খবর এল দেবব্রত মহারাজের অনুসন্ধান চলছে। উপস্থিত সন্ন্যাসীরা তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বললে নির্ভীক মা বললেন— কী হয়েছে? ওতো কিছু করেনি। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন?

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেহত্যাগ করলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। মা সেদিন অঝোরে কেঁদেছিলেন— তিনি মায়ের দৃষ্টিতে ছিলেন 'যোগীপুরুষ'। নির্যাতিত কারাজীবনের ফলশ্রুতিস্বরূপ অকালে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বছর ১৯ জুলাই বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ— মৃত্যুকালে গর্ভধারিণী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘজননী, ধর্মজননীর রাতুল পদস্পর্শের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করার পর মুখে দিব্যহাসি নিয়ে তিনি নিত্যধামে যাত্রা করেন।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'উদ্বোধনে' আশ্রয় লাভ করেন। হঠাৎ পুলিশের নজরে পড়ে— তাঁকে দেড় বছর উদ্বোধন ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হয়। তিনি লিখছেন— মা আমাকে বার বার অভয়বাণী শুনাইতে লাগিলেন— 'ভয় করো না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ মায়ের দীক্ষিত ছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ সেন ছিলেন মাখনলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তেরো বছর বয়সে বিয়ের মাত্র আটাশ দিন পর বিধবা হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতার কন্যা প্রফুল্লমুখী বসু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যোলো বছর বয়সে ছুটে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা ও স্বামী প্রেমানন্দের কাছে। শ্রীমা তাঁকে দেখেই বলে উঠেন : 'অত নিরাশ কেন মা? তুমি তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন'। মায়ের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়নি। অসহযোগ আন্দোলন এবং তৎপরবর্তীকালে বঙ্গের নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রফুল্লমুখী বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কুমিল্লা, হিজলী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা জেলে তিনি বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর কুমিল্লার সারদাদেবী মহিলা সমিতির প্রাণশক্তি ছিলেন। তরুণ দেশপ্রেমিক এবং পরবর্তীকালের প্রখ্যাত গান্ধীবাদী জননায়ক ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের, ১৩ সেপ্টেম্বর মাকে দর্শন করতে এলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শ্রীমায়ের পায়ে মাথা রেখে চরণবন্দনার সুযোগ পেয়েছি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীশ্রীমা আমার মাথায় হাত রেখে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিনের স্মৃতি আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। আমি জীবনে যখনই কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বা এখনও হই, তখন সেই মুহূর্তটিকে আমি স্মরণ করি।' তাঁর মতে, শ্রীমা 'মানুষ' নন, সাক্ষাৎ ভগবতী (যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী)।

বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘা যতীন) মায়ের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন ও আশীর্বাদ পেতেন। বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পঞ্চানন চক্রবর্তী জানান যে, পলাতক অবস্থায় 'মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাগনান হইতে বালেশ্বর যাত্রাকালে স্টেশনে শুনিতে পান শ্রীমা সারদাদেবী ওই ট্রেনে কোথাও যাইতেছেন। তিনি সকল বিপদ তুচ্ছ করে মায়ের কাছে ছুটিয়া যান এবং তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া যান।' প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত বুড়িবালাম যুদ্ধের বীর নায়ক বাঘাযতীন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে ধৃত বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার। ঘটনাচক্রে একবার বলেছিলেন, আহারাদি ত্যাগ করে (জেলের মধ্যে) আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন তাহলেই আমি খাব— কিন্তু তার সেই ইচ্ছা গোণ্ডির চরম অমানুষিকতায় পূরণ হয়নি। শ্রীমা সারদাদেবী শুধু ভারতের বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বব্যাপী এক অনাগত মহাবিপ্লবেরও প্রতীক। এ বিষয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁর আপাত সাধারণ জীবনের মধ্যে 'বিপ্লবের চিহ্ন কোথায়? রামকৃষ্ণ মিশনের শঙ্কর মহারাজের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছেন— ওই শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ— এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক।

# দুটি পদক জিতে ইতিহাস গড়লেন মনু ভাকের

**নিলয় সামন্ত**

মনু ভাকেরের হাত ধরে আর একটি পদক জিতলো ভারত। সরবজ্যোত সিংহকে সঙ্গে নিয়ে মনু ভাকেরের মিলিত সাফল্যে মিক্সড ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতলো ভারত। এই প্রথম কোনো ভারতীয় ক্রীড়াবিদ একটি অলিম্পিক্সে দু'টি পদক জিতে ইতিহাস গড়লেন। প্যারিস অলিম্পিক্সে দ্বিতীয় পদক জিতলো ভারত।

১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে প্রথম রাউন্ডে মনু ভাকের ও সরবজ্যোত সিংহের শুরুটা ভালো হয়নি। দুজনে মিলে প্রথম চেষ্টায় ১৮.৮ স্কোর করেছিলেন। টানা চার ম্যাচ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। শেষে ১২ তম প্রচেষ্টায় ভারত ২০.৮ স্কোর করেছিল। যেখানে কোরিয়া ২১.০ স্কোর করেছিল। টানা ১২ তম প্রচেষ্টার পরে, ভারত কোরিয়ার ওপরে ১৪-১০ এ এগিয়ে থাকে। এরপরে ১৩ শটে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ভারত। দক্ষিণ কোরিয়ার ওহ ইয়ে জিন এবং লি ওয়ানহোকে ১৬-১৯ এ হারিয়েছে ভারতের সরবজ্যোত সিংহ এবং মনু ভাকের।

এই ম্যাচ জেতার পরে সরবজ্যোত সিংহ বলেন, ম্যাচটা খুব একটা সহজ ছিল না। ম্যাচটা খুবই কঠিন ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচ জেতায় বেশ ভালো লাগছে। যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ পদক জেতার পর মনু ভাকের বলেন, এই জয়ের ফলে তিনি বেশ খুশি। নিজের সেরাটা তিনি দিয়েছেন এবং যা ফল এসেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট।

ভারতকে প্যারিস অলিম্পিক্সে আরও একটি পদক এনে দিয়েছেন মনু ভাকের। এক্ষেত্রে তিনি মিক্সড ডবল ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সরবজ্যোত সিংহকে সঙ্গী করে জিতেছেন ব্রঞ্জ পদক। গোটা দেশ তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকেই। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে জ্বলে ওঠেন হরিয়ানার এই কন্যা। সেই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেললেন তিনি। স্বাধীনতার পর মনু ভাকের হলেন প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ যিনি একই অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জয়ের নজির গড়লেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ভারতের এই জুটি। মনু ভাকের এবং সরবজ্যোত সিংহ ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে ১৬-১০ এ হারিয়ে দেয় কোরিয়ার প্রতিপক্ষকে। যে ছন্দে তাঁরা ইভেন্ট শুরু করেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল পদক আসতে পারে। সেই সম্ভবনাকেই সত্যি করে দেশকে এবারের অলিম্পিক্সে দ্বিতীয় পদক এনে দিলেন ২২ বছরের মনু এবং তাঁর সতীর্থ সবরজ্যোত সিংহ।

ভারতকে জোড়া পদক এনে দিয়ে ইতিহাস রচনা করা মনু ভাকেরের বাবা রামকৃষ্ণ ভাকের বলেন, আপনাদের যে উৎসাহ দেখেছি তাতে বোঝা যাচ্ছে কত বড়ো সাফল্য এটা। আমিও খুব খুশি। গোটা দেশের জন্য এটা একটা আনন্দের খবর। এই খুশির দিনে আমি সকল দেশবাসীকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা এত আশীর্বাদ দিয়েছেন ওকে, আর খারাপ সময় পাশে থেকেছেন। আমি ওর অতটা পাশে থাকতে পারতাম না, কারণ আমি নেভিতে চাকরি করি এবং আমায় বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ওকে ওর মা অনেক সাহায্য করেছেন। তাই ওর সাফল্যের পেছনে যে অবদান তার সবটুকু কৃতিত্ব দেবো ওর মাকে। মনু ভাকের দেশের হয়ে দ্বিতীয় পদক জেতার পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরবজ্যোত সিংহকেও তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হরিয়ানার শ্যুটারের কাছে প্রথম থেকেই পদকের আশা ছিল। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তৃতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন মনু। ফাইনালও শেষ করলেন তৃতীয় স্থানে থেকেই। যদিও ফাইনালে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের পয়েন্ট যোগ করা হয়নি। ফাইনালে ধারাবাহিক থাকতে পারেননি মনু। সাতটি শটে ১০-এর নীচে স্কোর করেন তিনি। তার মধ্যে একটি শটে স্কোর করেন ৯.৫। তিনটি শটে ৯.৬ স্কোর করেন। প্রথম স্টেজের পরই সোনা জেতার দৌড় থেকে কিছুটা পেছিয়ে যান মনু। তাও শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর চাপ সামলে দ্বিতীয় স্টেজে ভালো পারর্ফম করে দেশকে পদক দিলেন হরিয়ানার ২২ বছরের শ্যুটার। ২০১২ সালে লন্ডন ওলিম্পিক্সে শেষবার ভারতকে পদক এনে দিয়েছিলেন গগন নারাং। তিনিও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। তারপর দুটি অলিম্পিক্সে শ্যুটিং থেকে কোনও পদক আসেনি। সেই খরা কাটালেন মনু। হরিয়ানার তরুণীও সেই ব্রোঞ্জ পদক পেলেন। ▯

# ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রামে যোগদান কাকদ্বীপের ঋত্বিকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** আগামী ১১-১৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামায় হান্টস্‌ভিলে আয়োজিত হতে চলেছে 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম-২০২৪'। আমেরিকায় এই গবেষণাগারে মহাকাশ-বিজ্ঞানে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের নিয়ে চলবে ৫ দিনব্যাপী একটি এডুকেশনাল প্রোগ্রাম। মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ-সহ বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক ও কমিউনিকেশন সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত নানা জটিল বিষয়ে সমাধানের উদ্দেশে বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রী, মহাকাশ বিশেষজ্ঞ ও মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠিত টিমওয়ার্কের সমন্বিত রূপ হলো এই এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম। আগামী নভেম্বরে অ্যালাবামায় অনুষ্ঠিতব্য এই স্পেস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন কাকদ্বীপ— সুভাষনগর নিবাসী ঋত্বিকা মাইতি। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে স্নাতকের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ঋত্বিকা। তাঁর বিষয় হলো রসায়ন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোতে একটি আলোচনাসভাতে যোগ দিয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনা তুলে ধরেছিলেন ঋত্বিকা। তিন মাস পর নাসার বিজ্ঞানীদের সামনে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তাধারা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন ঋত্বিকা।

আমেরিকায় এই এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে প্রযুক্তিক্ষেত্রে নিয়োজিত মার্কিন সংস্থা এক্সা এয়ারোস্পেস। এক্সা এয়ারোস্পেস আয়োজিত এই স্পেস প্রোগ্রামে মহাকাশ গবেষণা বিষয়ে নাসার বিজ্ঞানীরা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে মৌলিক ভাবনাচিন্তার কথাও তাঁরা শুনবেন। মহাকাশ সংক্রান্ত একটি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র লিখেছিলেন ঋত্বিকা। গবেষণামূলক সেই প্রবন্ধে ঘটেছিল এই বিষয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনার প্রকাশ। এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম আয়োজনকারী মার্কিন সংস্থার কাছে পাঠানো হয়েছিল সেই প্রবন্ধ। গবেষণাপত্রটির গুণমান বিচার করে মার্কিন সংস্থার বিজ্ঞানীরা স্পেস প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য ঋত্বিকাকে মনোনীত করেন। মনোনয়নপ্রাপ্তির পরেই মার্কিন সংস্থা এক্সা এয়ারোস্পেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অনলাইনে ঋত্বিকার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। সেই ইন্টারভিউতে সাফল্য লাভ করেন ঋত্বিকা। এরপরই অ্যালাবামায় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজিত হতে চলা এই স্পেস প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কয়েকদিন আগে ঋত্বিকা সেই আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন।

মহাকাশ বিজ্ঞান ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়ে ঋত্বিকা বলেন, আমি প্রথম থেকেই মহাকাশ বিষয়ক তথ্য নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করি। এর আগে ইসরোয় যাই ও সফল হই। আগামী দিনে চাই দেশের নাম উজ্জ্বল করতে, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় অ্যালাবামা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা সন্দেহ রয়েছে।

কীভাবে এই স্পেস প্রোগ্রামে যোগ দেবেন ঋত্বিকা, তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত মাইতি পরিবার। ঋত্বিকার বাবা বিশ্বজ্যোতি মাইতি বলেন, এই প্রোগ্রামে যোগ দিতে হলে কমপক্ষে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমি পেশায় একজন শিক্ষক। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। জানিনা কীভাবে ঋত্বিকার স্বপ্নপূরণ হবে।

শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই ঋত্বিকার সফল বিদেশযাত্রা কামনা করবেন। সমাজসেবী সংস্থাগুলির সহায়তা পেলে নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হবেন ঋত্বিকা। মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত তাঁর মৌলিক ভাবনা অন্যদেরও একইভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ ও দক্ষতা এই প্রজন্মের সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ। □

## ইতিহাস কথা

# মহারাণার বিজয়গাথা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনচেতা সংগ্রামী বীর মহারাণা প্রতাপ সিংহের নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরন্তন হয়ে আছে। শিশোদিয়া বংশোদ্ভূত রাণা সংগ্রাম সিংহের পৌত্র মহারাণা প্রতাপ বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই কারণেই রাজপুতানার অন্যান্য শাসকরা যেখানে শুধু রাণা উপাধিতে ভূষিত হতেন, সেখানে প্রতাপ সিংহ তাঁর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের জন্য 'মহারাণা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মহারাণা প্রতাপ সিংহের জন্ম। ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুঘলরা চিতোর দখল করেছিল। প্রতাপের আবাল্য স্বপ্ন ছিল তিনি চিতোর পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন চিতোর পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না, ততদিন তিনি বৃক্ষতলায় তৃণশয্যায় শয়ন করবেন, সোনাদানা স্পর্শ করবেন না, গাছের পাতায় খাদ্য গ্রহণ করবেন। গোঁফ-দাড়ি কামাবেন না। জীবনের আদর্শকে এমনতর সুকঠিন ব্রতের সঙ্গে গ্রহণ করা এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। তাঁর মহিষী এবং দুই পুত্র এই ব্রত পালনে ছিলেন তাঁর সার্থক উত্তরসূরী।

তখন রাজপ্রাসাদ শত্রুদের করতলগত। তিনি কয়েকজন অনুচর সহ সপরিবার থাকতেন পর্বতকন্দরে। রাজমহিষী স্বহস্তে রান্না করতেন। হলদিঘাট রণাঙ্গণে চলতে লাগল মুঘলদের সঙ্গে তুমুল লড়াই। প্রতাপের বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অশ্ব চৈতক প্রভুকে পিঠে নিয়ে সমান তালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রভুর প্রাণসংশয় বুঝে প্রভুকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। ঝড়ঝঞ্ঝা, অনাহার, অর্ধাহার শুধুমাত্র দেশপ্রেমের জন্য মহারাণা প্রতাপ সব কষ্টই সহ্য করেছেন হাসিমুখে।

প্রতিকূল পরিস্থিতি একসময় মহারাণা প্রতাপকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি শত্রুদের দ্বারা দখল হতে লাগল, অর্থাভাব প্রকটভাবে দেখা দিল। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। এমন সময় তাঁর এক শুভানুধ্যায়ী জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময়ী স্বরচিত কবিতা পাঠালেন। সেই কবিতা পাঠ করে মহারাণা প্রতাপ উজ্জীবিত হলেন। আর তখনই তাঁর আর এক শুভানুধ্যায়ী দানবীর ভামা শা' তার সারা জীবনের উপার্জিত অর্থ মহারাণাকে দান করলেন। সেই অর্থে সৈন্য সংগ্রহ করে মহারাণা পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। তাঁর অসামান্য বীরত্বে ও প্রভাবে মুঘল বাদশা আকবরও সন্ত্রস্ত হলেন।

যুদ্ধ চলেছিল পঁচিশ বছর। মহারাণা প্রতাপ জীবন দান করেছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা শত্রুকে দান করেননি। ইতিহাসে তাই তাঁকে স্বাধীনতার পূজারি বলা হয়েছে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর বাদশা আকবর আর মেবার আক্রমণের সাহস করেনি। মহারাণা প্রতাপ সিংহ তাঁর পুত্র অমর সিংহের অন্তরেও স্বাধীনতার সুমহান আদর্শ প্রজ্বলিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পূজারি মহারাণা প্রতাপ সিংহ ভারতবাসীর অন্তরে সমুজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন।

**রূপশ্রী দত্ত**

পাহাড়-পর্বত

# বিহারীনাথ পাহাড়

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার উচ্চতম পাহাড় বিহারীনাথ। পাহাড়ের উচ্চতা ৪৫১ মিটার (১৪৮০ ফুট)। এই পাহাড় বাঁকুড়া শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার এবং শালতোড়া শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে বহু প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা গভীর ঘন বনে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের পাদদেশে একটি জলাধার রয়েছে। জলাধারটিকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বিহারীনাথ শিবমন্দির এবং জৈন মন্দির রয়েছে। শ্রাবণ মাসে এবং নবরাত্রির সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

## এসো সংস্কৃত শিখি-৩৪

**মাস্তু** (দরকার নেই)
বৃষ্টি: নাস্তি। ছত্রং মাস্তু।
(বৃষ্টি নেই, ছাতার দরকার নেই)

**অভ্যাস করি -১**
বুভুক্ষা নাস্তি। ভোজনং মাস্তু।
পরীক্ষা নাস্তি। পঠনং মাস্তু।
বালিকা অস্তি। বিবাহ মাস্তু।

**অভ্যাস করি-২**
ভয়ং মাস্তু। কোলাহল: মাস্তু। দু:খং মাস্তু। বিবাদ: মাস্তু।

**প্রয়োগ করি–**
কিং কিম্ মাস্তু?
নিষ্ঠুরতা, পীডনম্, অসূয়া, কলহ:, দ্রোহ:, উপহাস:, সংশয়:, দ্বেষ:,
নিরাশা, দুশ্চিন্তা, হতাশা, ঈর্ষা।

---

## ভালো কথা

# বনবেড়াল

একমাস আগে আমার বাবা একদিন মাঠে কাজ করে ফেরার সময় একটা বেড়ালছানা বাবার পিছু পিছু আমাদের বাড়ি এসেছে। ছানাটির গায়ে বাঘের মতো ডোরা কাটা দাগ আছে। কেউ কেউ বলছিল ওটা বাঘের ছানা। সাতদিন পরে ওটাকে বাবা জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার আমাদের বাড়ি ফিরে এসেছে। এখন আরও বড়ো হয়েছে। কুকুরের থেকে একটু ছোটো। কে যেন বনবিভাগে খবর দিয়েছিল। বনবিভাগের লোকেরা এসে ভালো করে দেখে বলল, ওটা বনবেড়াল।

**সমীর কুমার মাহাত,** নবম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

***তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।***

## শব্দের খেলা

***লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে***

(১) ল হো ন
(২) দ্ রু গু

***সঠিক ভাবে সাজাতে হবে***

(১) র ন ণ ধা জ সা
(২) ল র ধ তু ব ষা

**২৯ জুলাই সংখ্যার উত্তর**
(১) আদিকবি (২) মহাকবি

**২৯ জুলাই সংখ্যার উত্তর**
(১) অরণ্যদেবতা (২) অরূপরতন

**উত্তরদাতার নাম**
(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।
(২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা ৪৯।

***সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।***

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব**
**কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

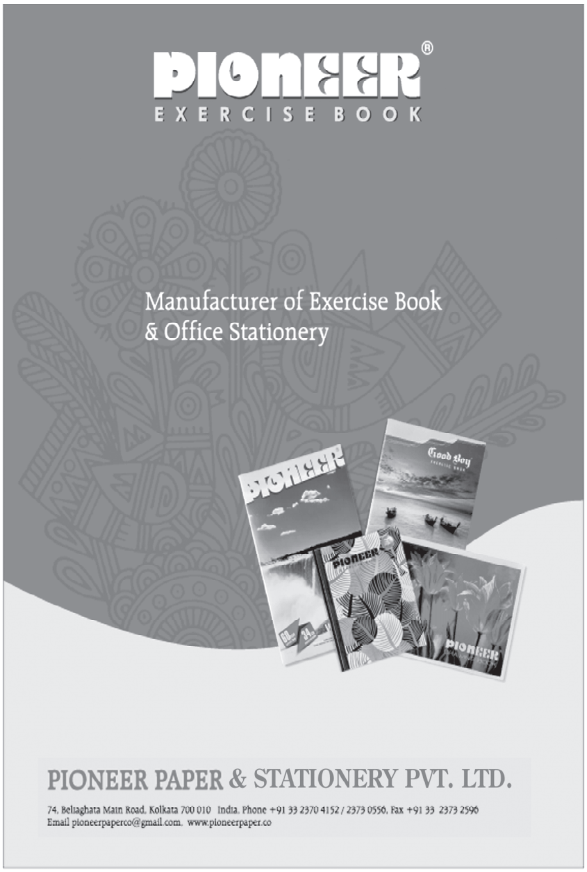


*With Best Compliments from -*

**A**

**Well wisher**

# বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ

**রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ক্ষুদ্র অংশ। অবিভক্ত বঙ্গেও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের একটি অনুন্নত জেলা হিসেবেই বাঁকুড়া পরিচিত। এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি কেমন ছিল, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় জেলায় কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল— এই সমস্ত বিষয় আলোচনার দাবি রাখে।

বাঁকুড়া জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। কংগ্রেস দল গঠনের পূর্ববর্তী প্রয়াস, কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন এবং অন্যান্য দল ও গোষ্ঠী পরিচালিত আন্দোলন। যদিও সঠিক অর্থে এই ভাগ করা যায় না; শুধু আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রয়াস।

বঙ্গের মসনদে বসার পুরস্কার স্বরূপ মিরকাশিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তিনটি চাকলা দান করে। ইংরেজরা রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ১৭৬৫-তে যে মিশন প্রেরণ করে তা এই অংশের জমিদার ও খাটোয়ালরা ভালো চোখে দেখেননি। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গানারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট সাঁওতাল, ভূমিজ ও নিম্নশ্রেণীর কৃষি মজুররা তাঁদের অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে যোগদান করেছিল। এই বিদ্রোহের নামকরণ করা হয়েছিল— 'চুয়াড় বিদ্রোহ।' প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে গঙ্গানারায়ণ অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসমায় প্রবেশ করেন। পরে ইংরেজ সরকার দুজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সৈন্যদল পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। এটি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপণের কাল বলা যায়।

বাঁকুড়া জেলায় দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে 'মণ্ডলি প্রথা' বদ্ধ জনজীবনে বহিরাগত মহাজনের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই অঞ্চলের ভূমিজ সম্প্রদায় জমিজমা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এর

গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ

প্রতিবাদে ঘটে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় ছোটোনাগপুর থেকে সংগ্রহ করা সৈন্য রায়গড় লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন বরাবর বাঁকুড়াতেই মোতায়েন থাকত। বিদ্রোহের সূত্রপাতে সৈন্যদল অন্যত্র বদলি করা হয়। বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্তী পাঞ্চেত, রাণীগঞ্জ ও পুরুলিয়াতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লেও বাঁকুড়ায় বিদ্রোহের তীব্রতা ও ব্যাপ্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

বাঁকুড়ার বুভুক্ষু ভূমিহীন মজুররা কাজের সন্ধানে যখন হন্যে হয়ে ঘুরতেন তখন তাঁদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে চালান করা হতো। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় তিন হাজার মজুর অসমে চালান করে দেওয়া হয়। বাঁকুড়া শহরে গন্ধেশ্বরী নদীর রামপুর ঘাটের পাশে একটি বড়ো কুলি ডিপো ছিল। মাত্রাতিরিক্ত রোজগার ও আশাতিরিক্ত অগ্রিম দাদন দিয়ে প্রচুর রোজগার করে বাড়ি ফিরে আসার লোভ দেখিয়ে জোর করে বন্ডে টিপসই নিয়ে কুলিদের চা-বাগানে প্রেরণ করা হতো। এতে ক্রীতদাসের মতো জীবন কাটাতে হতো। এতে অনেকেরই সেখানে মৃত্যু হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় সংবাদপত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ' প্রচার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে। জনমানসে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধে। পরবর্তীকালে এই ঘটনা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠে।

বাঁকুড়া জেলাতেও নীলচাষে বাধ্য করলে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। এর ব্যাপ্তি না হলেও এই আন্দোলন 'সিক্রেট সোসাইটি'র নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঁকুড়া শহরে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাস থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত ২২-২৩টি মামলা হয়েছিল। যুবকরা প্রকাশ্যে বিদেশিদ্রব্য নষ্ট করে, চিনি ও লবণের বস্তায় কেরোসিন ঢেলে দেন এবং বিদেশি দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ করেন। বাঁকুড়ার কুচিয়াকোল ও কোতুলপুর স্কুলের ছাত্ররা 'বাঁকুড়া গোপন সমিতি'র নেতৃত্বে আন্দোলনে শামিল হয়। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের পাশাপাশি বাঁকুড়ায় 'ভারতভাণ্ডার' নামে একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকান খোলা হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বিপ্লবীরা এই জেলায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। অম্বিকা

নগরের পত্তনিদার রাইচরণ বিমলদেব বিপ্লবীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত ছেঁদাপাথরের জঙ্গলে বিপ্লবী বারীন ঘোষ, বিভূতি সরকার প্রমুখ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিপ্লবীরা এখানে সংগৃহীত অস্ত্র রাখার জন্য ভূগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন। এখানে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এবং সাজ-সরঞ্জাম রাখা হতো। ছেঁদাপাথর যাওয়ার পথে পড়ত বাঁকুড়া শহর। এখানে কালীতলায় 'রামদাসের আখড়া'টিকে তাঁরা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোনোভাবে গোপন ঘাঁটির সন্ধান পায়। চার্লস টেগার্টের পুলিশ বাহিনী এখানে অভিযান করে। কিন্তু কাঁসাই ও কুমারী নদীতে বন্যা পরিস্থিতির জন্য তারা উভয় নদীর সঙ্গমস্থলের উত্তর পাড়ে লাউড্যাপাড়া গ্রামে অবস্থান করেন। বিপ্লবীরা রাইচরণ ধবলের সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে পানু রজক নামে এক ধোপা নিজের জীবন বিপন্ন করে বন্যাপ্লাবিত নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ে খবর দিতে সক্ষম হন। এর ফলে টেগার্টের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফেরার পথে টেগার্ট রামদাসের আখড়াটি তল্লাশি করেন এবং পাশের তিনতলা বাড়ির কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এঁদের উপর অকথ্য অত্যাচারে বিপ্লবীদের কোনো সংবাদ না পাওয়ায় পুলিশ দু' দফায় সকলকে ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই সময় বিপ্লবী প্রচেষ্টায় হত্যার অপরাধে বারীন ঘোষের সঙ্গে বাঁকুড়ার বিভূতি সরকারকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দমনের জন্য ১৯১৫-র মার্চ মাসে 'ভারত রক্ষা আইন' বিধিবদ্ধ করা হয়। বাঁকুড়া জেলায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে 'সিন্ধুবালা' নামে একজন মহিলাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ ছিল। বাঁকুড়া পুলিশ ইন্দাস থানায় দু'জন সিন্ধুবালা'র হদিস পায়। এই দুই মহিলাকে পুলিশ ইন্দাস গ্রামের রেলস্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এদের দুজনের কেউই সেই সিন্ধুবালা ছিলেন না। পুলিশ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। দুজনকেই মুক্তি দিতে হয়। এতে মহিলাদের মানসম্মানের প্রশ্নে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল।

গান্ধীজীর অসহযোগ আরম্ভের আগে বালগঙ্গাধর তিলক প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে স্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করে 'তিলকের মৃত্যুতে ভারত পবিত্র ও নির্ঝঞ্ঝাট হইল'— এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বাঁকুড়াতেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি ওয়েসলিয়ন কলেজের (খ্রিস্টান কলেজ) ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে ছাত্রসভা আহ্বান করতে পরামর্শ দেন। ছাত্ররা এতে উৎসাহিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এই সভা নিষিদ্ধ করেন। অধ্যক্ষের নিষেধ অমান্য করে কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, গণিতের শ্রীকান্ত কর্মকার এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির অধ্যাপক জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করার প্রস্তুতি নেন। অনিল রায়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। বক্তা ছিলেন বিজয়বাবু। তিনি তিলকের জীবনী আলোচনা করে সাধারণ মানুষকে


*With Best Compliments From :*

# ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

**18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001**
**Phone : 2243-6401 / 02**

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

**E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in**
**Fax : 91-33-22202260**
**GRAM : ALJUTLES**

**MILLS**

# Alliance Jute Mills

**Jagatdal 24 Paraganas**
**Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)**

দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। বাঁকুড়া শহরে স্টেটসম্যান পত্রিকার বাঙ্গালি গ্রাহকদের বাড়িতে পিকেটিং করে এই পত্রিকা বয়কটের আন্দোলনকে সফল করে তোলার আবেদন রাখেন। জেলার অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ দাস ভাষণ দেন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বের পুরোভাগে গান্ধীজী আসার পর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলায় তার আগে পিয়ারিভাই নামে এক সন্ন্যাসী এই আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বাঁকুড়ায় এসে দশ-বারো দিনের মধ্যেই শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে অন্তর্হিত হন। তিনি মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। এই সময় ছাত্র-শিক্ষক এবং জনমানসে একটা প্রভাব পড়ে। জেলায় স্বতঃস্ফূর্ততাকে সাংগঠনিক রূপ দেন অনিলবরণ রায়। তিনি অধ্যাপনার আগে রামদাস বাবাজীর কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কংগ্রেসের সম্পাদক হন। সভাপতি হন হরিকিষণ রাঠি এবং সহ-সভাপতি হয়েছিলেন গোপীনাথ দত্ত। কলেজ, হস্টেল ত্যাগী ছাত্রদের থাকা-খাওয়া তাঁদের প্রচেষ্টায় হয়। সাংগঠনিক বিষয় অবহিত করার জন্য নিয়মিত রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ মনীষীর রচনা সংগ্রহ করে ছোটো পাঠাগার স্থাপন করা হয়।

বাঁকুড়া জেলায় কংগ্রেস সংগঠন প্রসারে প্রয়াসী হন অনিলবাবু। বড়জোড়া থানার বৃন্দাবনপুরে কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং তার দুই পুত্র হেমচন্দ্র ও ক্ষেত্রগোপাল, পাত্রসায়রের প্রকাশচন্দ্র হাজরা, কোতুলপুরে মন্মথমল্লিক ও মতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জয়পুরের ভীমাচরণ বাগদি, সিমলাপালের রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর, খাতড়া থানার কাঁকড়াদাড়া গ্রামের গোবিন্দ মল্লিক ও গঙ্গাজল ঘাঁটীর গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ বাঁকুড়া জেলায় এক মহাপ্রাণ মানুষ। যিনি একধারে প্রধান শিক্ষক, দানী এবং মা সারদার প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় অভয় আশ্রমের উৎপাদিত খদ্দর বিক্রয়ের দোকান খোলা হয়। এর শাখা ছিল বিহারজুড়িয়া, বেতুড়, ইন্দপুর থানার ভেদুয়াশোল, খাতড়া থানার বহড়ামুড়ি গ্রামে তাঁত ও খদ্দর প্রস্তুতের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৫ সালে জেলার প্রথম সম্মেলন হয়। এতে সভানেত্রী ছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার। সম্মেলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কাজি নজরুল ইসলাম, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, বসন্ত মজুমদার, হেমন্ত কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন এবং সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ১৯২৬ সালে বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ চত্বরে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। এই বছরে সরোজিনী নাইডু একটি জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯২৭ সালে তৃতীয় সম্মেলন হয় সোনামুখীতে। সভাপতি ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে মহিলারাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বাঁকুড়া জেলার আইন অন্যান্য আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রথম সারির সকল নেতাই গ্রেপ্তার হন। তখন গোপনে সুশীলবাবু ও কমলবাবু নেতৃত্ব দেন।

বিশ শতকের প্রথমদিকে অনুশীলন, যুগান্তর ও আত্মোন্নতি সমিতির কার্যকলাপে বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলির গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যুবকদের মধ্যে নরমপন্থী, নেতাদের পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি আস্থা কমে আসছিল। তারা কিছু করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি সংগঠন যুবকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বাঁকুড়ার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম থেকে অনুশীলন দলের অন্যতম সদস্য যোগেশচন্দ্র দে এই স্কুলে ভর্তি হন। সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শহরের বাইরে রাজগ্রামে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠনের কাজে হাত দেন।

যুগান্তর দলের নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাঁকুড়া শহরে রাজবন্দি হয়ে আসেন। তিনি একবছর থাকাকালীন বাঁকুড়ায় যুগান্তর দলকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক নেতৃত্ব নীরদবরণ দত্তকে বাঁকুড়ায় পাঠান। তিনি বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া গ্রামে শারীর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। পরে স্কুল থেকে কর্মচ্যুত হন। এই সময় প্রভাকর বিরুণী, বিজয় তেওয়ারী, চিন্তাহরণ তেওয়ারী অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮টি ব্যায়াম সমিতি, চারটি লাইব্রেরি গড়ে উঠে। সেই সময় চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কর্মীরা এক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২২-২৩ জুন বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হয়। বগুড়া জেলার যতীন রায় সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাঁকুড়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাগ্মী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক মানবেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে জনমত সংগঠিত করতে পঞ্জাব থেকে শ্রীমতী কাউর ও তাঁর ভাই এ বি লাল বাঁকুড়ায় আসেন। হিন্দুদের সংগঠিত হতে আহ্বান জানান। প্রায় ৩০ জন আইনজীবী ২/১ জন ডাক্তার ও মধ্যবিত্ত সমাজের সক্রিয় সমর্থন অর্জন করেন তাঁরা। জেলায় বিভিন্ন স্থানে এর প্রচার শুরু হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বেদ শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় আসেন। বাঁকুড়া কলেজে 'হিন্দুছাত্র ফেডারেশন', হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড ও হিন্দু শক্তিসঙ্ঘ গড়ে উঠে।

১৯৪২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, আজাদহিন্দ বাহিনীর সেনাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন প্রভৃতি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় বাঁকুড়ায়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একত্রে অনেকে কর্মসূচিতে যোগ দেয়। ১৯৪৬ -এর ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন স্বাধীনতা দিবস পালন এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন জনসভায় আয়োজন করাও হয়েছিল। □


## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# ফিরে দেখা

# কলকাতা নরসংহার : ১৯৪৬

**গোপাল চক্রবর্তী**

১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই বোম্বেতে মুসলিম লিগের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের কর্ম পরিষদ এক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাইছে যে, এখন পাকিস্তান সৃষ্টি করার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দিতে হবে। ভারতীয় মুসলমানরা যাতে যথেষ্ট সম্মান ও সমৃদ্ধি সহকারে বাঁচতে পারেন এবং যাতে তাঁরা ব্রিটিশের অধীনে ক্রীতদাস হিসেবে না থাকেন সেই জন্য আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতে আমরা জাতিভিত্তিক হিন্দু আধিপত্য স্বীকার করবো না।'

উর্দু পত্রিকা 'আস্‌রে জাহিদ' বিভিন্ন উসকানিমূলক সংবাদের মাধ্যমে মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সম্পাদকীয়তে জেহাদের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এস. এম. ওসমান ছিলেন কলকাতার মেয়র। তাঁর নামে একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছিল— 'আমরা আল্লাহ্‌র নামে এক জেহাদ ঘোষণা করতে চলেছি। আমরা আপনাদের সামনে শপথ করে বলছি যে, আমাদের সমস্ত উদ্দামতা আপনাদের কর্মপ্রণোদনার উপর নির্ভরশীল। আসুন, এই সংঘর্ষে আমরা জয়যুক্ত হই। আমরা কাফেরদের (হিন্দু) নিশ্চিহ্ন করি। আমরা ইসলামের মহান সাম্রাজ্য স্থাপন করি।

অন্য একটি প্রচার পত্রে লেখা ছিল— 'হে কাফেররা তোমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে, এমন এক সংঘর্ষ দেখা যাবে, যার আঁচ থেকে তোমরা বাঁচতে পারবে না। আমরা আমাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবো। আমরা অভূতপূর্ব জয় করায়ত্ত করবো।'

আর একটি প্রচার পত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছে— 'ভারতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। আমাদের সকলের হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি থাকবে, আমরা আগামীকাল অর্থাৎ ১৬ আগস্ট এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করবো যাতে কেউ ঘুমাতে পারবে না।'

'যাঁরা চোর গুন্ডা, যাঁদের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে এবং যাঁরা নামাজ পড়েন না, তাঁরাও স্বাগত। বেহেশতের উজ্জ্বল প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, আসুন আমরা হাজারে হাজারে সেখানে প্রবেশ করি। আমরা আমাদের বিজয়ের জন্য আনন্দ প্রকাশ করি। জয় পাকিস্তান জয় মুসলমান।'

'কাফেররা, তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় তোমরা নিহত হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের গৌরব সকলের সামনে তুলে ধরবো। আমরা নিরঙ্কুশ জয় করায়ত্ত করবো।'

১ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৬, এমনি অসংখ্য প্রচার পত্র আর পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলিম লিগের কর্মী সমর্থকরা এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। সেই সঙ্গে পুরোদমে চলতে থাকে দাঙ্গার প্রস্তুতি। দাঙ্গার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী দাঙ্গাকারীদের যে ভয়ঙ্কর প্রস্তুতির বিবরণ পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ :

১. রাজাবাজারের মুসলমান যুবকেরা বিভিন্ন অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে। লালবাগান অঞ্চলেও একই দৃশ্য।

২. ধর্মতলা স্ট্রিটের বহু বাড়িতে গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় দেওয়া হলো।

৩. বেলগাছিয়া অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক তলোয়ার, লাঠি, ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। খিদিরপুর অঞ্চলেও একই দৃশ্য।

৪. মুসলমানেরা যে সব সংস্থা ও দোকানের মালিক সেখানে 'পাকিস্তান' শব্দটি লিখে দেওয়া হলো।

৫. মুসলিম লিগের কর্মী সমর্থকরা সশস্ত্র হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

৬. মুসলমান ছাত্রাবাসগুলিতে নেতৃত্বের এই নির্দেশ পৌঁছে গেল যে ছাত্ররা ১৬ আগস্ট সকাল থেকে বেরিয়ে এসে যেন রাস্তার যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে।

৭. মুসলমানদের মালিকানাধীন লরিগুলি লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, ইট দিয়ে বোঝাই করা হলো। ৮নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট এবং নাখোদা মসজিদে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হয়েছিল।

৮. রাস্তার লরি থামিয়ে তাতে জোর করে উঠে পড়ে জেহাদিরা।

৯. প্রধানমন্ত্রী (বাঙ্গলার) সুরাবর্দী এবং কলকাতার মেয়র মোহম্মদ ওসমান পেট্রলের কুপন বিলি করতে থাকেন, যাতে ১৬ আগস্ট থেকে জেহাদিরা পেট্রল দিয়ে সহজে হিন্দুদের বাড়ি ঘর এবং সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করতে পারে।

প্রচার এবং প্রস্তুতির পর নির্দিষ্ট দিন ১৬ আগস্ট শুরু হলো অ্যাকশান। কলকাতার বাইরে হাওড়া হুগলী থেকে মুসলমান লুটেরা এবং দাঙ্গাকারীরা আগেরদিন রাতেই

কলকাতায় চলে এসেছে। ভোর হবার আগেই শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। প্রথম ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে ভোর ৪.৩০ মিনিটে। সকাল ৭টা নাগাদ মানিকতলা বাজারে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। তবে এই দাঙ্গা ছিল একতরফা। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুসলমান দাঙ্গাকারীরা পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ করে নিরস্ত্র হিন্দুদের উপর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। সকাল ৯.৩০টায় বটতলা থানা মুসলমান দাঙ্গাকারীরা আক্রমণ করে। বটতলা থানা লালবাজার থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর জন্য আবেদন করে। দমদম রোডে হাজার হাজার মুসলমান দাঙ্গাকারী নিরীহ হিন্দুদের হত্যা, সম্পত্তি লুটপাট এবং বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। এখানে দাঙ্গাবাজরা হিন্দুদের উপর গুলিও ছোঁড়ে। গড়পার, যুগীপাড়া লেনেও হিন্দুরা দাঙ্গাবাজদের কবলে। প্রচুর সংখ্যক দুর্বৃত্তের অধিকারে থাকা হ্যারিসন রোড, কলেজস্ট্রিট, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, তারাচাঁদ দত্ত রোড, জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট এবং চিৎপুর রোডে তখন হিন্দুদের হত্যা, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ, লুট এবং ব্যাপক অগ্নিসংযোগ চলছে। ধর্মতলা-নিবাসী একজন বিচারক মি: বানার্জি একটি বাচ্চা ছেলের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। মুসলমান দাঙ্গাকারীরা সশস্ত্র এবং উত্তেজিত অবস্থায় মিছিল করে শিয়ালদহ থেকে বউবাজারের দিকে এগিয়ে যায়।

মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে আর পথে হিন্দুদের হত্যা করছে, দোকান বাড়িগুলিতে যথেচ্ছ লুঠপাট করছে। এই ধরনের আর একটি মিছিল একই ধরনের কাজ করতে করতে ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর একদল দাঙ্গাবাজ দুর্বৃত্ত খোলা তলোয়ার, ছুরি, লাঠি হাতে ছুটে চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। বেঙ্গল ক্লাবের উপর উন্মত্ত মুসলমান জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লাবটি প্রায় ধ্বংস করে দেয়। মেট্রো সিনেমার কাছে কে সি বিশ্বাসের বন্দুকের দোকানটি মুসলমান দাঙ্গাকারীরা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে সমস্ত বন্দুক, গুলি ও অন্যান্য অস্ত্র লুঠ করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুন্ডারা বিভিন্ন বস্তি এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে। হত্যা, লুঠপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ সব মিলে শহর কলকাতা নরকের চেহারা নিয়েছে।

১৬ আগস্ট ময়দানে মুসলিম লিগের জনসভা। সুরাবর্দি, ওসমান এবং নাজিমুদ্দিন ওই সভায় উত্তেজক ভাষণ দেন। তাঁরা কোনও ভাবে প্রশমিত করার চেষ্টা করেননি। উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের মাধ্যমে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুরাবর্দি দুষ্কৃতকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— 'তোমাদের ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো— যা করার তাই কর।'

এইবার হিন্দুদের উপর আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। বিশিষ্ট হিন্দুদের বাড়িগুলি আক্রান্ত এবং ভস্মীভূত হয়। নির্বিচারে হত্যা করা হয় বাড়ির লোকদের। আক্রান্ত হতে থাকে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসগুলি। ছাত্রদের হত্যা করা হয় ছাত্রীদের উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। বিশিষ্টজনেরা লালবাজারে ফোন করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন। বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) সুরাবর্দি তখন লালবাজারের পুলিশ কন্ট্রোল রুম দখল করে বসে আছেন। সুরাবর্দি একটার পর একটা চিরকুট পাঠিয়ে কমিশনারকে নির্দেশ দিচ্ছিল তার করণীয় কী? কমিশনার বলেছেন— 'আমি কী করতে পারি? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বসে একটার পর চিরকুট পাঠিয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করছেন।'

ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষার আবেদনে লালবাজারের পুলিশ প্রধান যে জবাব দিয়েছিলেন তা হাস্যকর ও তার অকর্মণ্যতার পরিচায়ক। তিনি বলেছেন :

১. কংগ্রেসের তরফ থেকে আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

২. মা কালী আপনাদের নিরাপত্তা দেবেন।

৩. নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করুন, এখন আমরা কিছুই করতে পারবো না।

৪. এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো অনুমতি পাওয়া যায়নি। আমরা নিরুপায়।

কলকাতার দাঙ্গায় ভীত সন্ত্রস্ত অনেক হিন্দু নৌকায় করে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে মুসলমান মাঝিমোল্লারা তাদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারে। ১৬ আগস্ট বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে যে কত হিন্দু নিহত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। পরেরদিন ১৭ আগস্ট সুরাবর্দি লালবাজারের পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দখল ছাড়েননি। সেখানে বসে তিনি পুরোপুরি দাঙ্গা পরিচালনা করছেন। মুসলমান দাঙ্গাকারীরা আগেরদিন যেখানে শেষ করেছিল পরদিন সেখান থেকেই শুরু করল। কিন্তু ১৭ আগস্ট বিকেল থেকে দাঙ্গার গতি প্রকৃতি পালটে গেল। গোপাল মুখার্জি, কলেজস্ট্রিটে তাঁদের একটি পারিবারিক মাংসের দোকান ছিল। তিনি এলাকায় গোপাল পাঁঠা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর একটি দল ছিল যাঁরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে বেড়াতো। দাঙ্গা যখন চরমে, হাজার হাজার হিন্দুর প্রাণ যাচ্ছে, সম্পত্তিহানি হচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে তখন শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু নেতা গোপালকে অনুরোধ করলেন প্রতিরোধে নামার জন্য।

এদিকে তাঁর দলের ছেলেরাও চারদিক থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর নিয়ে আসছে। এবার সশস্ত্র প্রতিরোধে নামলেন গোপাল মুখার্জি। সঙ্গে পেলেন যুগল চন্দ্র ঘোষ, রাম চ্যাটার্জীর মতো সংগঠকদের। সুরাবর্দির কৃপাধন্য মুসলমান গুন্ডারা ভাবতেও পারেনি তাদের এমন দুর্জয় প্রতিরোধের সামনে পড়তে হবে। মুসলমান গুন্ডারা যেখানে আক্রমণ করছে সেখানে প্রতিরোধ, পালটা মার। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে হিন্দু এবং শিখ যুবকরা এই প্রতিরোধে যোগ দিচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব এবং আখড়ার সদস্যরাও এই প্রতিরোধে শামিল হয়। রাজাবাজার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীদের উপর যে পৈশাচিক আক্রমণ চালানো হয় তা দেখে বা শুনে কোনো বিবেকবান হিন্দুযুবক নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। প্রতিরোধের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন ছিল, বড়বাজারের মাড়োয়ারি ও কলকাতার জৈন শিখ ব্যবসায়ীরা সেই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসেন। জেহাদিরা যখন পালটা মার খাচ্ছে এবং ক্রমে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে তখন সুরাবর্দি সেই মুসলমান দাঙ্গাবাজ জেহাদিদের নিরাপত্তার জন্য কার্ফু জারি করে সেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন। ততক্ষণে হিন্দুদের চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কত হিন্দু এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কারও মতে দশ, কেউ বলছেন বিশ, আবার কারও মতে ত্রিশ হাজার হিন্দু সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন। কত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে আর কত মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে সে হিসাব কে রেখেছে? পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকেরা এই ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপিত করেছে। □

# কেরালার ওয়েনাড়ের ধসে স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত ৩০ জুলাই কেরালার ওয়েনাড় জেলার একাধিক পাহাড়ি এলাকায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ব্যাপক ধস নামে। তার জেরে এখনও পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামার কারণে ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকে আছেন কয়েকশো মানুষ। প্রশাসনের তরফে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও নিখোঁজ শতাধিক মানুষ। উদ্ধারকাজে নেমেছে ভারতীয় সেনা। কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে— যে অঞ্চলগুলিতে ধস নেমেছে, সেখানে দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে সহায়তা করার জন্য কান্নুর ডিফেন্স সিকিউরিটি কোরের দুটি টিমকেও ওয়েনাড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকাজে নামানো হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারও। প্রবল বৃষ্টির জেরে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। কেরালার ওয়েনাড়ে এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী-এনডিআরএফের পাশাপাশি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অসংখ্য স্বয়ংসেবক। ওয়েনাড়ের চূড়ালমালায় কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ চালানোর সঙ্গে ধস-আক্রান্ত মানুষের হাতে ত্রাণ তুলে দিচ্ছেন সেবা ভারতীর কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা।

সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বয়ংসেবকরা রাস্তা পরিষ্কার করার পাশাপাশি মানুষের উদ্ধার কাজ শুরু করেছেন। দুর্গতদের খাবার সরবরাহ করে চলেছেন স্বয়ংসেবকরা। মৃতদেহও উদ্ধার করছেন তাঁরা। সেনা ও এনডিআরএফ-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধস পীড়িত মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন শতাধিক স্বয়ংসেবক। কেউ কোথাও যেতে চাইলে, সেখানে পৌঁছে দিচ্ছেন স্বয়ংসেবকরা। আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাও করেছে সঙ্ঘ। চূড়ালমালা এলাকায় 'চিতাগ্নি' নামে একটি চলমান সৎকার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা মৃতদেহের সৎকার করছেন। বিভিন্ন জায়গায় এখনও গাছের গুড়ি পড়ে রয়েছে, কাদা জমে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা বলে রাজ্য সরকারকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জেপি নাড্ডা পার্টির সদস্যদের উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর তরফে নিহতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে।

ওয়েনাড়ে উদ্ধারকাজে শামিল হয়ে দুজন স্বয়ংসেবক (প্রজেশ ও শরথ) প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় একটি ভূমিধসের পর তাঁরা বিধ্বস্ত এলাকা থেকে বৃদ্ধ ও শিশুদের উদ্ধার করার সময় দ্বিতীয় ধসের মুখে পড়েন। ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূরে প্রজেশের দেহ উদ্ধার হলেও শরথের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

# বাংলাদেশে সামরিক ও ইসলামিক অভ্যুত্থান, হাসিনা সরকারের পতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশ জুড়ে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। কোটা বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে তুমুল জেহাদি তাণ্ডবের সাক্ষী থাকে বাংলাদেশ। গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোটা সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের ওয়ান-পয়েন্ট এজেন্ডায় অনড় থাকে ইসলামপন্থী সংগঠনগুলি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও হিংসা বন্ধে গত ১ আগস্ট জামায়াত-এ-ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়। ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, ইনস্টাগ্রামকে নিষিদ্ধ করা হয়। গত ৪ আগস্ট পরিস্থিতি মারাত্মক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উন্মত্ত জনতা থানাগুলিকে আক্রমণ করতে থাকে, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। জেহাদি সংগঠনগুলির তরফে ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিবাস— 'গণভবন' ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হয়। গত ৫ আগস্ট সকাল থেকেই কার্ফু ভেঙে লক্ষাধিক উন্মত্ত জেহাদি জনতা রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগে সম্মত হন। এরপর তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতে আসার প্রয়োজনীয় অনুমতি চান। এরপর তিনি পদত্যাগ করেন এবং একটি হেলিকপ্টারে চেপে ভারতে পৌঁছান। তিনি দেশ ছাড়ার পরই বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান একটি প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণের কথা জানিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা জানান। বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে এই সরকার গঠিত হতে পারে বলে খবর। বাংলাদেশে প্রায় ১৯ হাজার ভারতীয় অবস্থান করছেন, তাদের মধ্যে ৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

গাজিয়াবাদের কাছে হিন্ডন বিমানঘাঁটিতে গত ৫ আগস্ট রাতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে হাসিনার সাক্ষাৎ হয়। এরপর গত ৬ আগস্ট সকাল ১০টায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওইদিন সংসদে বাংলাদেশের পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা দেন বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর। বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভেঙে ফেলা, গণভবন লুঠ ছাড়াও আমেরিকার নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কনস্যুলেটেও ভাঙচুর চালানো হয়। গত ৪ ও ৫ আগস্ট সাতক্ষীরা, যশোর, ফেনী, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রামে একাধিক মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। গত ৬ আগস্ট যশোরের একটি পাঁচতারা হোটেলে জেহাদিরা আগুন লাগিয়ে দিলে ২৪ জন জীবন্ত দগ্ধ হন। বাংলাদেশ জুড়ে জামায়াতের তরফে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন চলছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
INDIA TRADE MARK
R
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

# স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

*পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা*

**থাকছে**

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা